আজগুবি

শ্রীবেতাল

প্রকাশক—শ্রীআশুতোষ ঘোষ
গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১এ, রামকিষণ দাস লেন, কলিকাতা
শ্রীশরৎশশী রায় দ্বারা মুদ্রিত।

জবাবদিহি

"আজ্‌গুবি"র কতকগুলি গল্প বিদেশী লেখকদের ছায়া নিয়ে লেখা।

শরৎ ১৩৩৬

ইতি

শ্রীবেতাল।

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	সত্যি কথা	১
২।	শাস্তি	৮
৩।	রাজকুমারীর জন্মতিথি ...	১৮
৪।	পাগল-হাঁস ও বাঘ বনের কাহিনী	২৪
৫।	অতিকায়	৩১
৬।	রাজা-হজম	৪৪
৭।	সোনার কৌটা ...	৫০
৮।	চূষী	৫৪
৯।	সিপাহী	৬৩
১০।	ইতি শেষ	৬৯

আজগুবি

সত্যি কথা

চণ্ডীচরণ বাবুর মত ঔদরিক আর আছে কি না সন্দেহ। বছর নয়েক বয়স থেকেই 'ডান হাতের' ব্যাপারে তিনি এমন পারদর্শী যে এই ঊণপঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাঁর জোড়া বোধ হয় আর কোথাও মেলা ভার।

এত খাওয়ার যা ধ্রুব ফল—তাই হোল। একাদশ বছর বয়সেই চণ্ডীবাবুর ওজন হোল এক মণ বাইশ সের পৌণে তিন ছটাক। এতদিনে ওজনটা বা'ড়তে বা'ড়তে কত যে হোত ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু ওজনটা ত আর বা'ড়তে পেলই না, মাঝ থেকে এমন একটা মজার কাণ্ড হোল যে ভাবলে এখনও হাসি পায়!

আজ্‌গুবি

সকাল থেকে চণ্ডীচরণ বাড়ীতেই থাকেন, হাত আর মুখ তাঁর চলতে থাকে অবিরত। ঘুম থেকে উঠেই আড়াই সের ঘন দুধ, গোটা সাঁইত্রিশ মণ্ডা দিয়ে জল-যোগ হয়; ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই আরও কিছু খাওয়া চাইই—সেই কোন্ ভোরে কি একটু পেটে পড়েছে কি না—আর এই তালেই সারাদিন তাঁর আহার চলতে থাকে।

চণ্ডীবাবুর সে রহস্যটা কিন্তু শুধু আমিই জানি। সেটা জানাজানি হয়ে গেলে তাঁর আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না বলে চণ্ডীবাবু আমাকে ভারী খাতির করেন। কাজে-অকাজে, একলা কি লোকের মাঝে যখনই দুজনে দেখা হয়, তাঁর ছোট ছোট মেষ চক্ষু দুটো আমার মুখের পানে চেয়ে করুণ মিনতি করে; সারা মুখখানা কাঁচুমাচু হয়ে অনুরোধ করে—ব্যাপারটা যেন ফাঁশ না করে দিই।

কতদিন আমি তাঁকে বলেছি যে কোন ভয় নাই, কাউকে আমি বলব না। কিন্তু আমার কথায় বোধ হয় তাঁর বিশ্বাস হয় না নইলে যখন তখন তিনি আমার পানে অমন সকরুণ চাইবেন কেন?

ব্যাপারটা তোমাদের আমি বলতাম না কখনও।

কিন্তু কাল সন্ধ্যাবেলাই আমি তিন সত্যি করে ফেলেছি যে হাঠের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গ্‌তেই হবে।

সাতদিন আগে থেকে হরি ঘোষ বলে দিয়েছে তার বাড়ী আমাদের নেমন্তন্ন; দিন কয়েক আগেই চণ্ডীবাবুর চোখ তুটো আবার অনুনয় করেছে; তবু কাল সন্ধ্যা-বেলা খেতে খেতে এগার বার আমার দিকে তিনি অমন করে চাইলেন কেন? বলির পাঁঠার মত ছল ছল চোখে আমার পানে চেয়ে অমন কাষ্ঠহাসি হাসলেন কেন?—আমি ঠিক করেছিলাম ব্যাপারটা কাউকে বলব না; কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার সঙ্কল্প ঠিক ছিল, কিন্তু আর না! বার বার চণ্ডীবাবু অমন করে অনুনয় করেন কেন? আমি কি একটা কথা পেটে রাখ'তে পারি না যে বার বার আমাকে মনে পড়িয়ে দিতেই হবে? অপমানে আমার কাণের ডগা লাল হয়ে উঠেছে—সব কথা আজ আমি বলে দেবই।

বেচারা চণ্ডীবাবু; বড্ড ব্যথা পাবে!—তার আমি কি করব? আমি কি এতই ছোটলোক যে আমার কথায় বিশ্বাস না করে বার বার আমায় অনুরোধ করতে হবে তুচ্ছ একটা ব্যাপারের জন্য? চণ্ডীবাবুর বয়স যখন একচল্লিশ বৎসর তখন থেকে তাঁর সাথে আমার আলাপ,

এতদিনেও কি তিনি আমাকে চিনতে পারেন নি যে আমি এক কথার মানুষ? যখন কথা দিয়েছি তখন কিছুতেই সে কথা বলব না—কিছুতেই না।

বলতাম না ঠিকই; কিন্তু কালকের সে ব্যাপারটার জন্য বলতে হবেই; এত অপমান আর সহ্য হয় না। তাই অনেক ভেবে দেখেছি যে বলাই ভালো।

*   *   *

আমার সাথে আলাপ হবার নয় মাস পরেই চণ্ডীবাবুর ওজন হ'ল তিন মণ ঊণচল্লিশ সের। শরীরটা এত ভারী হয়ে যাওয়াতে মনে দুশ্চিন্তা হওয়ারই কথা. তাই কেমন করে রোগা হওয়া যায় চণ্ডীবাবু খুব ভাবতে লাগলেন।

পণ্ডিতরা বলেন যে আমরা যে বিষয়টা খুব ভাবি, সেটা স্বপ্নে ঠিক আমাদের মনে ভেসে ওঠে। চণ্ডীবাবুরও ঠিক তাই হোল। কি করে রোগা হওয়া যায় ভাবতে ভাবতে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন।

শনিবার দিন ভোরবেলা ঘুমের ঘোরে তিনি টের পেলেন যেন একটি পাতলা ছিপ্‌ছিপে দেবশিশু এসে তাঁর নাকের ডগায় এক পায় দাঁড়াল। খুব মিষ্টি ক'রে, ভোমরার মত গুণগুণিয়ে বল্‌ল, যে তা'র দেওয়া ওষুধ

খেলে আড়াই দিনের মধ্যে ওজন কমে যাবেই।
—নন্দনের অপরাজিতা গাছের শেকড় বেঁটে খেতে হবে উটের ডিমের সাথে; তবে যদি উটের ডিম সহসা না পাওয়া যায় তা'হলে ছারপোকার রস দিয়েও খাওয়া চলতে পারে, কিন্তু তাতে একটু মুস্কিল আছে। মুস্কিলটা যে কী তা' আর চণ্ডীচরণ জা'নল না। আহ্লাদে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল; জেগে উঠে দেখে পাঞ্জাবীর পকেটে কালো মতন কি একটা। নন্দনের অপরাজিতার শেকড় ভেবে সেটা মাথায় ঠেকিয়ে সে তুলে রাখ্‌ল।

উটের ডিম আর কোথায় পাওয়া যাবে? তাই ছারপোকার রস দিয়েই চণ্ডীচরণ দৈব ওষুধটা সেবা করল। কিন্তু ফলে হোল উল্টো বিপত্তি। দেবশিশুর কথা কি মিছে হয়? বেচারা চণ্ডীচরণ স্বপ্নে দেখেনি যে মুস্কিলটা কি হবে? তা'হলে সে কি আর ওষুধ খেতে যেত?

শনিবার ভোরে ওষুধ পাওয়া গিয়েছিল। একে শনিবার তায় ভোরের স্বপন, সে কি আর বিফল হ'বার? তাই পাঁজি দেখে চণ্ডীচরণ মঙ্গলবার গোধূলি লগ্নে ওষুধটা খেয়ে নিল।

বৃহস্পতিবার ভোরে—ঘুম ভালো হয়ে ভাঙ্গে নি—

গোলমালে আমার তন্দ্রা ছুটে গেল। ব্যাপার কি ?–চণ্ডীচরণের ছোকড়া চাকড়টা হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসেছে,–ভয়ে তা'র কথা ফোটে না; যেন মিনিট খানেক আগেই একটা মামদো ভূত তার সাথে কোলা-কুলি করে গিয়েছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা করে সে যা বল্ল তার অর্থ যে আমাকে এখনই যেতে হবে, বিপদ গুরুতর।

পথে যেতে যেতে যতই জিজ্ঞাসা করি, ছোকরা কিছুই বলে না, আকাশ পানে চেয়ে শুধু বিড়বিড় করে, –"বাস্ রে বেলুনের মত সাঁ করে" চণ্ডীচরণের বাসায় পঁহুচে তাড়াতাড়ি আমি ওপরে ওঠে গেলাম, চাকরটা রইল নীচে।

চণ্ডীর ঘরের দুয়োর ঠেলতেই খুলে গেল, কিন্তু চণ্ডীচরণ কই ? একটু অবাক হয়ে ডাকলাম "চণ্ডী-বাবু !" একটা কোণ থেকে সাড়া এল, "এই যে !" মুখ তুলে চেয়ে দেখি আশ্চর্য্য ! ঘরের ছাদে, দেয়ালের এক কোণে বৃহৎ একটা পোঁটলার মত চণ্ডীবাবু ঝুলছে।

অবাক হয়ে ডাকলাম "চণ্ডীবাবু, চণ্ডীবাবু" ক্ষীণ উত্তর এল, "দোরটা লাগিয়ে দিন, পথের কেউ দেখ্তে পাবে।"

দেবশিশুর স্বপ্নের কথা, ওষুধের কথা, উটের ডিমের কথা, ছারপোকার রসের কথা, কিছুই আমি জানতাম না। চণ্ডীবাবু তখন ছাদের কোণ থেকে বিনিয়ে বিনিয়ে আমায় সব বললে, আর উপসংহারে জানিয়ে দিলে যে মঙ্গলবারে গোধূলিতে ওষুধটা খাওয়ার পরই শরীরটা কেমন হাল্‌কা হাল্‌কা বোধ হতে লাগল, সেদিন ভোরে সাড়ে চারটার সময় ঘুম ভেঙ্গে দেখতে পেলেন যে অল্প অল্প করে হাওয়ায় ভেসে তিনি ওপরে উঠ্‌ছেন, তেরো মিনিটের মধ্যেই ছাদে গিয়ে ঠেকেছেন ; ভাগ্যি ছাদটা ছিল, নইলে এতক্ষণ বেলুনের মত কোথায় চলে যেতেন কে জানে ?

আমি স্তম্ভিত—এগুলো কি ? গাঁজা না স্বপ্ন ? তাই বা বলি কি করে ? চণ্ডীচরণ যে চোখের সামনে ছাদে ঝুলছিল।

যাই হোক্ একটা টুলের ওপর চড়ে টানাটানি করে তাঁকে মেঝেতে নামিয়ে এনেছি—হায়রে অদৃষ্ট, হঠাৎ হাতটা একটু ঢিল হয়ে যাওয়াতে হাউইএর মত সাঁ করে তিনি ছুটে গেলেন, ছাদের সঙ্গে গুঁতো লেগে ভুঁড়িটা টোল খেয়ে গেল, বেচারা চণ্ডীবাবু বড্ড ব্যথা পেল।

আবার টানাটানি করে নামিয়ে এনে তাঁকে খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে দুই খাটের সাথে বেঁধে দিলাম। হাওয়ায় ভরা পালের মত, গ্যাসে ভরা বেলুনের মত, চণ্ডীবাবু উড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু ভারী খাটটা তাঁকে ধরে রাখল পৃথিবীতে।

আবার এক বিপদ! হালকা হওয়ার পর থেকেই তাঁর খাবার ইচ্ছেটা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। কি আর করি? খাটের তলে চণ্ডীবাবুকে থালা থালা খাবার জোগাতে হ'ল, বেচারা মারা না পড়ে।

এমন করে আর ক'দিন চলতে পারে? লোক-সমাজে বার হতে হবে ত! তাই চণ্ডীবাবু আর আমি ভীষণ পরামর্শ করতে লাগলাম, কি করলে তিনি আবার মাটির ওপর সোজা হ'য়ে থা'কতে পারেন। সাতদিন কেটে গেল, কোন বুদ্ধিই মাথায় এল না। আট দিনের দিন সকালে স্নানের আগে তেল মাখছি, হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল—অমনি ছুট চণ্ডীবাবুর কাছে।

লোহা জিনিষটা বিষম ভারী! পাঁচ সাত মন লোহা নিয়ে ওড়া চালাকী নয়। ধুতি চাদরের নীচে আগাগোড়া মোটা লোহার পোষাক পরে, পকেটে দশ বার সের লোহা রেখে, লোহার জুতো পায়ে, আর

একটা মোটা লোহার ডাণ্ডা হাতে নিলে চণ্ডীবাবুকে ওড়ায় কার সাধ্য !

চণ্ডীবাবুকে মতলবখানা বললাম্। তাঁর যে কত ভাল লাগল, কী আর বলব ? পরদিনই আগাগোড়া লোহায় মুড়ে ওপরে ধুতি চাদর চড়িয়ে ভদ্র হয়ে চণ্ডীবাবু পথে বের হলেন ; এবার আর বেলুনের মত উড়ছেন না কিছুতেই।

এই হোল চণ্ডীবাবুর রহস্য। তিনি বাস্তবিক হাওয়ার চেয়েও হাল্‌কা, বেলুনের মতন ভুয়ো। লোহার পোষাক আছে বলেই তিনি আমার মত, তোমার মত, সাধারণ লোকের মত, চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন নইলে এতক্ষণ তাঁকে হাউইএর মতই উড়ে যেত হ'ত, সাঁ———

শাস্তি

আমাদের ক্লাবে পড়তে যাওয়ার নিখিলের ভারী সখ। কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক সে যখন তখন মোটা মোটা বই পেড়ে নিয়ে লাইব্রেরী ঘরে পড়তে বসে যায়। তার আশে পাশে উঁচু ক্লাসের ছেলেরা বসে লেখা পড়া করে, কথাবার্ত্তা কয়, সময়ে সময়ে গণ্ডগোলও করে। কিন্তু নিখিল সমানে চুপি চুপি কোনদিকে না চেয়ে পাতার পর পাতা উল্টে যায়। এই নিয়ে কতদিন আমরা তাকে ঠাট্টা করেছি, কিন্তু কোনদিন সে কারো কথা শোনে না। আমাদের মানা করাতে তার পড়বার ইচ্ছাটা যেন হু হু করে আরো বেড়ে ওঠে। সময় নেই অসময় নেই, সে লাইব্রেরীতে বসে মোটা মোটা বই নিয়ে নাড়া চাড়া করে। ছেলেবেলা থেকেই তার চোখ খারাপ ; তাই বড় বড়, গোল গোল চশমা নাকে লাগিয়ে মুখ ভার করে নিখিল যখন বই পড়তে থাকে তখন দেখে মনে হত যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জমা খরচের হিসাবটা এর হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে আর সে হিসাব যেন কিছুতেই মিলিয়ে উঠতে পারছে না।

একদিন দুপুর বেলা আমরা সবাই লাইব্রেরী ঘরে বসে পড়ছি, এমন সময় কোথা থেকে তাড়াহুড়ো করে নিখিল এসে ঘরে ঢুক্‌ল। রোজই সে আরো অনেক আগে আসে, আজ দেরী হয়ে যাওয়াতে বড়ই ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকতেই, নিখিল একজনের ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ল ; তার গালাগালি খেয়ে টাল সামলাতে না সামলাতেই একটা টুলে আবার এক হোঁচট ! পড়তে পড়তে খুব বেঁচে গিয়ে টল্‌তে টল্‌তে নিখিল একটা বড় আলমারীর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। একেবারে ওপর থেকে একটা মোটা বই যেমন পাড়তে যাওয়া, অমনি হাত ফসকে সেই অত ভারী মোটা বইটা এসে পড়ল তার নাকের ওপরে। চোখ থেকে চশমাটা ঠিক্‌রে গেল, একদিকের আধখানা কাঁচ গেল ভেঙ্গে। হাত থেকে গড়িয়ে বইটা টেবিলের উপর পড়ল, ঝন ঝন করে দোয়াত কলম উল্‌টে গেল, কালী ফেলে, জিনিষ পত্র ভেঙ্গে, হঠাৎ সব যেন কিম্ভুত কিমাকার হয়ে দাঁড়াল।

বইটা হাত থেকে পড়ে যেতেই সেই যে নিখিল নাকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এদিকে সব লণ্ড ভণ্ড হয়ে যাওয়াতেও সে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। এক হাতে দেড় খানা চশমা, আর এক হাতে আধখানা

ভাঙ্গা কাঁচ নিয়ে মুখখানা অসম্ভব রকম গম্ভীর ও করুণ করে নিখিল যখন একটা বড় চেয়ারে বসে পড়ল, তখন কোথা থেকে দুজন ছোকরা মতন লোক তার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে ডাকল। নিখিল তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে গুটি গুটি তাদের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে কি কথা বার্ত্তা হল কে জানে, কিন্তু খানিক পরেই নিখিল আবার এসে ঘরে ঢুক্‌ল, তার বাঁ কাঁধের নিচে নম্বর আঁটা কি একটা চাক্‌তি মত ঝুলছে। আমরা নিখিলের সঙ্গে কথা বলবার—কি হয়েছে জানবার কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে যে ঠোঁট দুটো এঁটে বসল, আমাদের কত সাধ্য সাধনাতেও একবার হাঁ করল না।

মজার একটা কিছু হয়েছে মনে করে আমরা একে একে সরে পড়লাম। পরদিন ক্লাবে এসে দেখি নিখিল চুপ করে চেয়ারে বসে একখানা বই পড়ছে। তা'র সঙ্গে কথা কইবার মতলবে যেমনি তার দিকে উঠে যাব ভাবছি অমনি নিতান্ত বেরসিকের মত সে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘর ছেড়ে গেলাম। নিখিল কিন্তু শুধুই পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় কারো সঙ্গে

দেখা হলেই একেবারে মুখ কাঁচুমাচু করে, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলে কোনই উত্তর না দিয়ে কেবল বোকার মত তাকিয়ে থাকে, না হয় ধীরে ধীরে চলে যায়। আবার কখনও কখনও বা পকেট থেকে কাগজ পেন্‌সিল বার করে তার উপর গম্ভীর ভাবে উত্তর লিখে দেয়।

কথা সে কিছুতেই বলবে না—কেন তা' আমরা কি জানি! সমস্ত দুপুরটা এমনি ভাবে কাটিয়ে বিকেল বেলা ধীরে ধীরে নিখিল বাড়ী ফিরে গেল।

পরদিন আমাদের একটা বৈঠক্ ছিল; তাতে যার যা ইচ্ছা হত বলতে পারত। আমরা সবাই বৈঠকে জমায়েৎ এমন সময় ধীরে ধীরে নিখিল এসে উপস্থিত। বারে বারে সে রিষ্ট ওয়াচের দিকে তাকায়, থেকে থেকে দেয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে চায় আর মনে মনে যেন ভীষণ বিরক্ত হয়ে ওঠে।

বৈঠক্ তখন লোকে ভরে উঠেছে কেউ উঠে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করলেই হয় এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে সেই দুজন ছোকরা যারা নিখিলকে সে দিন বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল—এসে নিখিলকে তুলে দাঁড় করিয়ে বলল, নিখিলবাবু আজ আপনি কিছু বলুন।

আজগুবি

হাত ঘড়ির দিকে একটীবার মাত্র চেয়ে নিখিল নীরবে ঘাড় নাড়ল। কিন্তু কে কার কথা শোনে! চারিদিক থেকে সবাই হেঁকে উঠল তা হবে না, আজ আপনাকে উঠতেই হবে—বলুন—বলুন। নীরবে নিখিল দেয়ালের দিকে চায় একটা বাজতে সাত মিনিট, আর ঘাড় নাড়ে। ততই সবাই জেদ করে; না নিখিলবাবু, বলতেই হবে আজ, চারিদিক থেকে সবাই নিখিলকে ঘিরে ধরল। একটা বাজতে তিন মিনিট। নিখিলের যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠল। একজন বাঁ হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় আর একজন ডান হাত ধরে টেনে রাখে—দোটানায় পড়ে নিলিখ যায় যায়।

নিখিল আর পারল না। চোখ মুখ তার লাল হয়ে উঠ্ল, মাথার ভিতর দিয়ে যেন আগুন বেরোতে লাগ্ল কান হুটো ভোঁ ভোঁ করে উঠল; রাগ, ভয়, লজ্জা সব এক সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে যেন নিখিলকে হঠাৎ কাঁদিয়ে ফেল্ল। কি জানি কেন হঠাৎ সবারি হাত ছাড়িয়ে নিখিল এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘড়িতে বেজে উঠল ঠং।

নিখিলের পেছনে পেছনে আমরাও ক'জন বেরিয়ে এলাম ব্যাপার কি বুঝতে। ছুট্তে ছুট্তে নিখিল

গিয়ে ঢুক্‌ল ক্লাবের বড় কর্ত্তার ঘরে। আমরাও ঢুকে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে।

কান্নাবিকৃত স্বরে, নাকপাড়া চোখমোছার মধ্য দিয়ে নিখিল যা বলল তার ভাবার্থ এই যে নিখিল আর ক্লাবের শাস্তি সহ্য করতে পারে না। ও ক্লাবে সে আর কখনও আসবে না, এখনই সে চলল।

কর্ত্তা একটু হতভম্ভ হয়ে পড়লেন। তিনি বরাবরই ঐ এক রকমের। আছেন ত বেশ আছেন ; কিন্তু কেউ কিছু এসে বললে তাঁর আর মাথা ঠিক থাকে না। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বড় চঞ্চল হয়ে ওঠেন, সব মিটমাট ঠিক্‌ঠাক করার বদলে ব্যাপারটা বরং একটু বিশেষ রকমের জটিলই করে তোলেন। নিখিলের করুণ নিবেদন শুনে তিনি আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না। "তাই নাকি, তাই নাকি" বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে, একবার সামনে তিনবার পেছনে তাকিয়ে কি করবেন, ঠিক্ করতে না পেরে আবার সেই চেয়ারে বসে পড়লেন। নিখিলের নাক ঝাড়া আর চোখ মোছা তখনও সমানে চলেছে। বহুকষ্টে অনেক প্রশ্নোত্তরের পর ব্যাপারটা যা বুঝলাম এই—

সেদিন হাত থেকে বই পড়ে যাওয়ার পর নিখিল

যখন খিন্ন মনে চেয়ারে বসে ছিল তখন দুটি ছেলে এসে তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল এ পর্য্যন্ত ত আমরা জানি। তারপর বাইরে গিয়ে ছেলে দুটি তাকে বললেন যে সে ক্লাবের সকল নিয়ম লঙ্ঘন করে পাড়তে গিয়ে বই ফেলেছে, দোয়াত উল্টেছে আবার একজনের ঘাড়ের উপর পড়েছে। অতএব এর শাস্তি স্বরূপ তাকে আট চল্লিশ ঘণ্টা একলা থাকতে হবে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তার কাঁধে একটা চাক্তি ঝুলিয়ে তাঁরা বললেন যে সে যে অপরাধী এই তার চিহ্ন।

দুর্ব্বিপাকটা হয়েছিল ২ দিন আগে বেলা প্রায় একটার সময়। তাই সে দিন একটা পর্য্যন্ত নিখিলের মৌন ব্রত। কিন্তু একটা বাজবার সাত মিনিট আগে তারা দুজন বৈঠকে সকলের সামনে তার যে অপমানটা করেছে তা আর নিখিল সহ্য করতে পারল না। সে ক্লাব ছেড়ে দিতে রাজী আছে, এত শাস্তি তার সইবে না।

বড় কর্ত্তা ঘাড় নেড়ে, আঙ্গুল মট্‌কে যা বললেন তাতে বোঝা গেল যে ক্লাবে এমন শাস্তি দেবার নিয়ম কোথাও নাই, শাস্তি দেবার জন্য লোকও রাখা হয়

নাই। করুণ কণ্ঠে নিখিল সেই লোক দুজনের বর্ণনা করার পর বড় কর্ত্তা হঠাৎ তাদের চিনে ফেললেন। হাসি চাপতে গিয়ে কাশতে কাশতে বিষম খেয়ে বললেন যে তারাও এই ক্লাবে খেলা ধূলা করতে, বই পড়তে আসে, নিখিলের সঙ্গে বাস্তবিক তাদের কোনও পার্থক্য নাই।

আমরা এগিয়ে নিখিলের কাছে গেলাম। দেখি তাকে অপরাধী চিহ্ন স্বরূপ যে তক্‌মা দেওয়া হয়েছিল, সেটা আর কিছুই নয় সিগারেটের টিনের একটা চাক্‌তি মাত্র।

নিখিল বেরিয়ে এল। আমরাও এলাম। পিছু পিছু ঠিক দরজার পাশেই সেই দুজন ছোকরা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে; তাদের মুখ দেখে মনে হয় যে আর একটু হাসতে হলে তারা বোধ হয় মরেই যাবে, এতই তারা হেসেছে।

তাদের দিকে আগুনের ঝলকের মত একটিবার চেয়েই নিখিল চলে গেল।

রাজকুমারীর জন্মতিথি

রাজকুমারী বেলারাণী আজ চারের কোল ছেড়ে পাঁচের পিঠে পা দিয়েছে, আজ তা'র জন্মদিন। চার বছর আগে আজকার মতই টুকটুকে এক সকাল বেলা ফুট্‌ফুটে বেলারাণী পৃথিবীর বুকে নেবে এসেছিল। আজকার মতই আলোতে হাসিতে, গানে আর ফুলে সেদিনও চারিদিক হেসে উঠেছিল; রাঙ্গা শিশুসূর্য্য সোণালী রঙে আকাশের পটে সুখবরটা ছড়িয়ে দিয়ে-ছিল, পাখীর দল একতালে গলা মিলিয়ে গান গেয়ে বলেছিল যে একটা কাণ্ডর মতই কাণ্ড হয়ে গেল।

চারের কোল ছেড়ে রাজকুমারী আজ পাঁচের পিঠে পা দিয়েছে; চার বছর আর পাঁচ বছরে কত তফাত—আকাশ পাতাল। চার বছরের, সে ত শিশু; পাঁচ বছর হলেই সে যেন একটু খানি বড়। চার বছরের, সে ত নিতান্তই ছেলে মানুষ, নিতান্তই কচি; পাঁচ বছর হলেই সে যেন একটুখানি কম ছেলে মানুষ একটু কম কচি। তাই রাজকুমারীর অসীম আনন্দ; আহ্লাদে তা'র গোলাপী গাল টোল খেয়ে গিয়েছে, পাতলা ঠোঁটজোড়ার ফাঁকে কুন্দ-কুঁড়ির মত খান কয়েক

ধবধবে দাঁত মুচ্‌কি হেসে বলে দিয়েছে যে বেলারাণী আর ছোট্টটি নাই, এবার সে নিশ্চয়ই একটু বড় হয়েছে।

চারিধারে আলো, মালা, হাসি, আকাশ কাঁপিয়ে, বাতাস নাচিয়ে সানাই বাঁশীর মিঠে গান ; আশে পাশে রংবেরং এর খোকা-খুকুর মেলা। বেলারাণী রাজ-কুমারী হলে কি হয়, সাধারণ লোকের মত, অতি গরীবের খুকীটির মতোই, বছরে মাত্র তা'র একটি বার জন্মদিন—রাজকুমারী হলেও রোজ ত তার জন্ম-তিথির উৎসব হয় না !

তাই রাজকুমারী আজ হাতে হাতে, কোলে কোলে ফেরে। আদর করে সবাই তার রাঙ্গা তুল্‌তুলে গাল টিপে টিপে আরও লাল করে দেয় ; যাদের গাল টিপ্‌বার অধিকার নাই, তারা শুধু দূর থেকে তাকিয়ে দেখে, আর তারিফ করে।

রাজকুমারীর জন্মতিথি উৎসবে কত রকম খেলা হবে, রাজ্যের লোক এসেছে খেলা দেখতে।

তুরাণ থেকে এক যাদুকর এসেছে—বেলারাণীর চোখের সামনে কাবুলী বেদানার দানা মাটিতে পুঁতে, সদ্য সদ্য গাছ জন্মিয়ে সে রাঙ্গা বেদানা ফলিয়ে দিলে।

ইরাণ থেকে এক বেদুইন এসেছে,—বেলারাণীর সখীর হাতের বাঁশীটা নিয়ে খাসা একটা নীল পাখী বানিয়ে দিল। ডানা মেলে বেলারাণীর মাথার ওপর দিয়ে পাখীটা উড়ে গেল। রাজকুমারীর মুখে হাসি ধরে না।

আরব থেকে এক দাড়ীওয়ালা এসেছে ;—বেলা-রাণীকে একুশবার কুর্ণিশ করে, বাঁ হাঁটুর ওপর ডান হাত রেখে, ঝোলাঝুলি সামনে ধরে সে ব'সল। হুকুম হতেই মস্ত বড় এক থলে থেকে দুই কাণে ধরে সে বার ক'রল ছোট্ট একটা খরগোসের ছানা। কাপড় চাপা দিয়ে বার কয়েক যাদু-মন্ত্র পড়ে দিতেই—ও মা, খরগোসের ছানা মিলিয়ে গিয়ে ধাড়ী একটা কালো ইঁদুর। আবার কাপড় মুড়ি দিয়ে বাঁশীতে পোঁ দিতেই এক জোড়া সাদা পায়রা হয়ে ইঁদুরটা উড়ে গেল। বেলারণী হেসে গড়িয়ে প'ড়ল,—আহ্লাদে !

সব খেলা শেষ হতেই কোলে চ'ড়ে আট ঘোড়ার গাড়ীতে রাজকুমারী প্রাসাদে ফিরে গেল ; তারই জন্মতিথিতে আজ বিরাট্ ভোজ। কত লোক যে রাজ-বাড়ীতে পাতা পেতেছে তা' আর গোণা যায় না। খাওয়ার পর বেদম নাচ-গান, সবাই মশগুল্। রাজ-

কুমারী বেলারাণী ছোট ছোট পায়ে গুটি গুটি কোথায় [illegible]পড়েছে, কেউ লক্ষ্য করে নি।

চুপি চুপি রাজকুমারী বাগানে এসে উপস্থিত। বকুল গাছের তলে ব'সে, একটা আধ-ফোটা চাঁপার কলি ছিঁড়্‌তে ছিঁড়্‌তে আপন ভাষায় সে গান গায়। সূয্যি তখন আকাশের মাঝখান ছেড়ে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে, মৌমাছিদের মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে গিয়েছে, ফুলের সব মধু আজই লুটে নেওয়া চাই। জুঁই-চামেলী আর পারুল-টগরে তুমুল কলহ লেগে গেছে—কে বড়? গন্ধ ভালো কা'র? এদের ছেলেমানুষী দেখে লজ্জায় গোলাপ রাঙ্গা হয়ে উঠেছে, সে যে এদের চেয়ে অনেক বড়। ছোট ছোট প্রজাপতি-গুলো রেষারেষি করে আপন আপন রঙ্গীন জামা দেখিয়ে উড়ে বেড়ায়, সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে টিক্‌টিকির দল চোখ বুঁজে ফড়িংএর গান শোনে। গাছের কচি পাতাগুলো পাখীদের হিংসে করে আপনা-আপনি বলাবলি করে যে পাখীর চেয়ে পাতা-জাতি অনেক ভালো। পাখীরা ভবঘুরে, লক্ষ্মীছাড়ার দল; কখন তা'রা কোথায় যায়, কোনদিন তা'রা কোথায় থাকে, কেউ কি জানে? তা'দের না আছে ঘর, না

আছে বাড়ী! কখনও কি তা'দের নামে একটা চিঠি-পত্র আসে?—তা'দের ঠিকানাই নাই চিঠি লি'খবে কে?

মাথার ওপরে ঘুরে ঘুঁরে পাখীর ঝাঁক তা'দের "ছোটলোক, ছোটলোক!" ব'লে গালাগালি দিতে স্বুরু করতেই, বাগানের কাঠবিড়ালীগুলো রাজপ্রাসাদের ময়ূরকে মধ্যস্থ মেনে নিয়ে বিচার ক'রতে বলে। ক্রেঙ্কার-ধ্বনি তুলে ময়ূর উত্তর দেয়, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!" শ্বেত পাথরের হ্রদে যে কয়টা লাল মাছ থাকে, এক সাথে তারা ঘাড় তুলে জানতে চায়, ব্যাপারটা এমন কী হয়েছে!

* * *

—রাজকুমারী বেলারাণী কই? ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে বকুল ফুলের রাশির ওপর ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসে।

খোঁজ, খোঁজ! রাজপ্রাসাদে সাড়া পড়ে যায়—রাজকুমারী কই? চারিধারে সেপাই শান্ত্রী ছোটে, লোকজনের হৈ চৈ হট্টগোলে নগর তোলপাড়।

খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে রাজরাণী বাগানে আসেন; বকুল গাছের তলে, কচি কচি হাতে মাথা গুঁজে বেলারাণী

ঘুমে বিভোর। দুষ্টু সূয্যি, পাতার ফাঁকে ফাঁকে চুপি চুপি তা'র বাঁ গালে চুমো খায়।

কোলে তুলে, ডান গালে চুমো খেয়ে রাজরাণী আদর করে বেলারাণীকে শুধু বলেন, "বোকা মেয়ে!"

"পাগল-হাঁস" ও "বাঘ-বনের" কাহিনী

'হিউলিন্' ছিল দাসের মেয়ে—দাসকন্যা। খুব ছোট বেলাতেই তা'র বাবা তাকে একটা বড় মহাজনের কাছে বিক্রী করেছিল। সে মহাজনটা এত নিষ্ঠুর যে পাড়ার ছেলেরা তা'র নাম রেখেছিল 'পাষাণ-হিয়া'। সকল সময়েই সে 'হিউলিন'কে দিয়ে কাজ করাত, এক মিনিটও বস্‌তে কি খেলা করতে দেখলেই মার মার ক'রে তেড়ে আসত।

একদিন দুপুর বেলা অনেকক্ষণ খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে বেচারা 'হিউলিন্' একটু জিরুচ্ছে—এমন সময় পাষাণ-হিয়া তেড়ে এসে তাকে খুব বক্‌তে আরম্ভ কর্লে। বকুনি থেকে মার আরম্ভ হোল; মারতে মারতে সেদিন 'হিউলিন'কে প্রায় আধমরা করে ফেলে দিয়ে সে ঘরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে লাগ্‌ল।

কাঁদতে কাঁদতে হিউলিন প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে, এময় সময় সে শুনতে পেল, যেন কে তার নাম ধরে

ডাকছে। তাড়াতাড়ি চোখ চেয়ে হিউলিন দেখে যে তার বন্ধু চাঙ্ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হিউলিন্ জিজ্ঞাসা করল—"কি ভাই হংসরাজ, কি মনে করে ?" চাঙ্ বলল—"তা ত' বলব।" কিন্তু আগে বলত, তুমি কাঁদছ কেন ? আবার আজ মার খেয়েছ বোধ হয় ?" 'হিউলিন্' ফিস্‌ফিস্ করে বল্‌ল—চুপ্ ভাই চুপ্ তোমার গলা শুনতে পেলেই আবার তেড়ে আসবে। চাঙ্ বল্‌ল—"তবে একটা কথা বলি শোন—তুমি ত জান আমার মালিক এক থুড়থুড়ে বুড়ো আর কৃপণের ধারী। আজ ভোরবেলা হঠাৎ তা'র ঘরে গিয়ে দেখি যে সে বেশ সুন্দর একজন ছোক্‌রা সেজে নাক ডাকাচ্ছে। আমি ত হতভম্ব ! কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পার ?"

চাঙের কথা শুনে হিউলিন্ নিজের পিঠের বেদনা একদম্ ভুলে গিয়েছিল। ডান্ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখটা দাঁত দিয়ে কামড়াতে কামড়াতে ভেবে বলল, দেখ চাঙ, "আমার মনে হয় যে সে তা'হলে নিশ্চয় একটা পরী"। চাঙ বল্‌লে—"তাই না কি ? পরীরা বুঝি অমনি চেহারা বদলাতে পারে ? হিউলিন্ একটু হেসে বলল, ওমা ! তাও জাননা পরীদের ত' ঐ কাজ। এই এখন এক রকম আর দেখতে না দেখতেই আর

এক রকমের চেহারা।" এক মিনিট ভেবে চাঙ্ পরামর্শ দিল,—"তবে এক কাজ কর না কেন? আমার মনিব যদি পরীই হয় তবে তার কাছে তুমি পালিয়ে চল না? সে ত নিশ্চয়ই পাষাণ-হিয়ার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারবে।" এই শুনে হিউলিন ভারি খুসী। কিন্তু তাইত' যে পালাবে কেমন করে। পাষাণ-হিয়া একবার দেখতে পেলেই ত···। কি করে! চাঙ্ অনেক করে বলাতে হিউলিন পা টিপে টিপে পাষাণ-হিয়ার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এক দৌড়ে চাঙের মনিবের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। চাঙের মনিব সে সময় কি কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল তাই চাঙ্ তার বন্ধুকে এ ঘর সে ঘর দেখিয়ে বেড়াতে লাগ্ল।

দুই বন্ধু গল্পে মস্গুল এমন সময় দোরের গোড়ায় কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুজনে ত ভয়ে কাঠ। যদি পাষাণ-হিয়া হিউলিনের খোঁজে এসে থাকে ত এইবার তাকে ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু ও মা! ঘরে এসে ঢুকল চাঙের মনিব—বুড়ো থুরথুরে। এদিকে চাঙ্দের হল বেজায় ভয়। বুড়ো পরী রাগ করে ভস্ম করে ফেলে যদি! তাই তারা দুই বন্ধু তাড়াতড়ি একটা বড় আলমারীর পিছনে লুকিয়ে

পড়ল। সেই বুড়ো কিন্তু কিছুতেই ঘর থেকে বেরোয় না। ভয়ে চাঙ্‌রা আলমারীর পেছন থেকে বেরোতেও পারে না, আবার আলমারীর পেছনে আর কতক্ষণ থাকা যায়? এদিকে হয়েছে কি, সমস্ত দিন খেটে-খুটে এসে চাঙের মনিব বেজায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে আর আলমারীর পেছনে চাঙ্‌রাও ঢুলতে ঢুলতে চোখ বুঁজেছে।

হঠাৎ ভোর বেলায় হিউলিনের ঘুম গিয়েছে ভেঙ্গে। তাড়াতাড়ি সে চাঙকে ঠেলে তুল্‌লে। খাটের দিকে চোখ পড়তেই দুই বন্ধু এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে— "আরে এ কি"—সেই থুড় থুড়ে বুড়োটার বদলে খাটে শুয়ে এক সুন্দর যুবক। ওদের চেঁচামিচিতে সেই লোকটার ঘুম ভেঙ্গে যেতেই তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে চাঙ্ আর হিউলিনকে দেখে সে বেজায় হতভম্ভ। আর হিউলিন মনে মনে ভাবছে এইবার বুঝি পরী তাকে ভস্ম করে ফেলে। যা হোক, সাহস করে এগিয়ে এসে চাঙ বললে "তুমি কে গো; কাল রাতে আমার বুড়ো মনিব খাটে শুয়েছিল, আর রাতের মধ্যে তুমি তাকে কোথায় উড়িয়ে ফেললে"। লোকটী বল্লে কেন, "চাঙ আমিই ত তোমার মনিব"। চাঙ উত্তর দিল—

"ওরে আমার মনিবরে, আমার মনিব হল এক বুড়ো, আর ইনি কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন।" তাই শুনেই লোকটা পাগলের মত ঘর ময় ছুটোছুটি করতে করতে চেঁচাতে লাগল—"যাকগে, এবার আমি ভাল হলাম, এবার আমি ভাল হলাম।" হিউলিন ত এ সব দেখে একেবারে 'থ'। তখন সেই লোকটা বলতে লাগল—"দেখ তোমরা নিশ্চয় এসব কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছ। যাক, আমি সব কথা বলছি।"

আমি হচ্ছি এক রাজপুত্র। ছেলে বেলায় আমি ভূত পেত্নী জীন্ পরী কিছুই মানতাম না। লোকে বলত যে কোন একটা কুঁয়ার ভিতর এক বুড়ো মামদো

অনেকদিন থেকে বাস করত। কিন্তু আমি একদিন ঠাট্টা করে সেই কুঁয়ার ভিতর একটা তীর ছুড়ে বললাম ভূতটা এতদিনে মরল। তাই শুনে ভূতটা আমায় শাপ দিলে আমি থুড়থুড়ে বুড়ো হয়ে যাব। শুধু রাত্রি বেলা ঘুমোবার সময় আমি নিজের চেহারা ফিরে পাব। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই আমি আবার যে বুড়ো সেই বুড়ো। তখন আমার বাপ অনেক করে ভূতের পূজো করলেন, তাতে ভূতটা একটু খুসী হয়ে বলল—"যদি কখনও পাগলা হাঁস বাঘ বনকে তোমার কাছে নিয়ে

আসে তবেই তোমার ছেলে ভাল হবে।" আজ এতদিনে সেই সর্ত্ত পূরণ হল, আমিও ভাল হলাম।" তত্‌ক্ষণে চাঙ চটে উঠে বলল, আমি কেমন করে পাগল হলাম! তখন সেই রাজপুত্র হিউলিনকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে হিউলিন নিজের নাম বলাতে সে বলল কেন, এই ত ঠিক মিলে গিয়েছে। "চাঙ্ মানে পাগল, আর তুমি জাতিতে হাঁস, কাজেই তুমি হলে পাগলা হাঁস। হিউ মানে বাঘ আর লিন মানে যে বন. তা' কে না জানে? তা'হলেই পাগল হাঁস আজ বাঘবনকে এখানে নিয়ে এল।" এই কথা শুনে দুই বন্ধু ভারী খুসী।

ঠিক এমনি সময়ে সদর দুয়োরে দমাদম ধাক্কা। শব্দ শুনেই হিউলিনের মুখ শুকিয়ে গেল—সে বুঝতে পারলে যে পাষাণ হিয়া তারি খোঁজে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি সব কথা চাঙের মনিবকে বলে তার কাছে আশ্রয় চাইলে। সে অভয় দিয়ে বল্‌লে, "তুমি কিছু ভেবনা, তুমি যেমন শাপ থেকে আমাকে রক্ষা করলে আমিও তেমনি রাক্ষসটার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাব।" এই বলে সে দিল ঘরের দুয়োর খুলে। ঘরের মধ্যে হিউলিনকে দেখে পাষাণ-হিয়া চটে লাল। রেগে

যেমনি সে তাকে মারতে যাবে অমনি রাজপুত্র বল্লে, খবরদার! আমি এ দেশের রাজার ছেলে, তুমি হিউলিনকে আমার কাছে লক্ষ টাকায় বিক্রী কর। পাষাণ হিয়া আর কি করে। লক্ষ টাকা নিয়ে গুটি গুটি চলে গেল। রাজপুত্রের পায়ের ধারে পড়ে হিউলিন বল্‌লে—"আজ আপনি আমাকে বাঁচালেন, আমি চিরদিন আপনার ক্রীতদাসী হয়ে থাকব।" রাজ পুত্র তাকে বুকে টেনে নিয়ে বল্‌ল—"সে কি! তুমি আমার রাণী হবে, আমি যে তোমাকে ভালবাসি। তারপর একদিন হিউলিনের সঙ্গে রাজ পুত্রের বিয়ে হয়ে গেল—তারা রাজার কাছে ফিরে গেল—চাঙ্‌ও গেল সঙ্গে সঙ্গে। দাসের মেয়ে হ'ল রাজরাণী আর চাঙ হয়ে গেল প্রধান মন্ত্রী।

অতিকায়

বনমালী ছিল কারিকর। তা'র তৈরী কলের খেলনা বাজারে বিক্রীও হ'ত প্রচুর। তা'র কলের বাঁদর গাছ বেয়ে ওঠে, চাবি দেওয়া রাজ হাঁস জলে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ এক সময় ধাঁ করে ডুব মারে, স্প্রিং দেওয়া ব্যাং গুলো বিনা ভূমিকায় বেতালে লাফিয়ে এসে গায়ে পড়ে। ছেলের দলে বনমালীর পসার ছিল খুবই। তাকে দেখলে ছেলেরা ছাড়ে না, সকলেই আবদার করে, একটা খাসা কলের খেলনা চাই, বনমালীও ভাল মানুষ কি না,—ছেলেদের সঙ্গে বেজায় ভাব।

এমনি করে দিন কাটে। বনমালী রং বেরংএর খেলনা করে; যা পয়সা পায় তাতেই চলে যায়। যখন হাতে কাজ থাকে না, একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসে বাক্স পিটিয়ে গুণ গুণ করে গান গায়।

হঠাৎ একদিন সকালে বনমালীর দেখা নাই। পাড়ার ছেলেরা তার বাসায় গিয়ে খবর নেয়, বনমালীর বউ বলে অনেক রাতে সে যে কোথায় গিয়েছে কে

জানে। সাত মাস তের দিন পরে আর একদিন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে পাড়ার ছেলেরা শোনে সেই রাতে বনমালী আবার ফিরে এসেছে—কিন্তু কোথায় যে গিয়েছিল কাউকে বলে না। যাক গে, নাই বা বল্ল। বনমালী ফিরে ত এসেছে;—আবার বাঁদর গাছে চড়বে, আবার রাজ হাঁস ডুব পাড়বে আবার ব্যাং বেতালে লাফাবে।

বনমালী কিন্তু বড় বিষণ্ণ, কি হয়েছে জানতে চাইলে বলে একটা কাজে বিশেষ ব্যস্ত। বাড়ী গিয়ে ছেলেরা তার দেখা পায় না, বনমালী নিজের কারখানা ঘরে কি একটা কাজ করে। চার ধার হতে ছেলেরা উঁকি মারে, কিছুই দেখা যায় না।

ঘরের ভিতর বনমালী কি করে বলি—সেই যে সাত মাস তের দিন আগে বনমালী হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, কোথায় গিয়েছিল জান?—কোন এক সাধুর দেখা পেয়ে তাঁর কাছে না কি সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখতে গিয়েছিল। সঞ্জীবনী মন্ত্রের বলে যার প্রাণ নাই তাকেও প্রাণ দেওয়া যায়, কিন্তু মন্ত্রটার দোষ এই যে সেটা খাটে মোটে একটিবার।

সেই সাধুর কাছ থেকে ফিরে এসে বনমালীর

খেয়াল চেপেছে যে একটা অতিকায় মানুষ সে গড়ে তুলবে। মানুষটা হবে অবশ্য কলের, গায়ে হবে তার কোটী মানুষের জোর—প্রাণের জন্য চিন্তা কি?—সে ত প্রাণ দিতেই পারে।

তাই কাজ কর্ম্ম ছেড়ে, নাওয়া-খাওয়া ভুলে বনমালী মেতে গেল এক অতিকায় মানুষ গড়তে। উজ্জ্বল একটা আলোর পাশে, নিজের কারখানায় সে হাঁটু পেতে বসেছে; পায়ের কাছে তার লম্বা একটা মানুষের শরীর পড়ে। সাতটা মানুষের মত লম্বা, সেই রকম নণ্ডা চেহারা খানা। সবে মাত্র বনমালী তার কলের মানুষের বুকে পাঁজরা কটা বসিয়েছে; নাড়ী ভুঁড়ি এঁটে দেওয়া হয়েছে তার আগেই। হাড়গুলো ঠিক বসান হলে পাতলা একটা কাটা চামড়া দিয়ে বনমালী শরীরটা ঢেকে দিল। সেই পাতলা চামড়ার ভিতর দিয়ে তখনও তার বুকের পাঁজরা গুলো গোনা যাচ্ছিল। খাসা, সুন্দর, এক খানা চেহারা গড়ে তুলবে এই ছিল বনমালীর মতলব; সেটা যে এমন বিশ্রী হয়ে পড়বে, তা সে কখনও ভাবে নি। মানুষটাকে ত অমনি রাখা যায় না, তাই খান চার পাঁচ ধুতি জুড়ে বনমালী তাকে কাপড় পরিয়ে দিল, ছেড়া খান খান কাপড় জড়িয়ে

গায়ে দিল এক অদ্ভূত জামা। সব শেষ হলে বনমালী সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়তে স্নুরু করল।

বাপ্‌রে! কি অদ্ভূত ব্যাপার! মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সেই বড় বড় দুটো . ঘোলাটে চোখ পাতা উল্টে খুলে গেল; স্বচ্ছ, কাচের মতই, স্থির, নিশ্চল সে চাহনি। চোখের পানে চাইলেই যেন অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। হাতের শিরা গুলো নীল হয়ে ফুলে দপ্ দপ্ করে উঠল, তামাটে রংএর পা দুটো একটুখানি নড়ে, হাড় বের করা বুকখানা একটু কেঁপে, সেই নীরব ঘরে নিশীথ রাতে, বিরাট জড়পিণ্ড সজীব, সচেতন হয়ে উঠ্‌ল। বনমালী আর চাইতে পারল না; তারই সৃষ্ট জীব যে এমন ভয়াবহ হয়ে উঠবে, সে স্বপ্নেও ভাবে নি। দুহাতে মুখ ঢেকে ঘর থেকে সে ছুটে বেরিয়ে গেল,—ভয়ে সে মৃতপ্রায়!

রাতটা কোথা দিয়ে কেটে গেল বনমালী টেরও পেল না। ভোর বেলা গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সোনার তারের মত সূয্যির আলো এসে সবুজ ঘাসের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। ঘাসের ডগায় শিশির ফোঁটার গায়ে রোদ লাগতেই সে গুলো লক্ষ হীরা বসান মুকুটের মত ঝলমল করে উঠল। ভোরের বাতাসের

সাথে সাথেই বনমালীর হারান সাহস ফিরে এল। টিপে টিপে পা ফেলে কারখানার ভিতর সে উঁকি মারল, তারই তৈরী বিরাট্ রাক্ষস কি করছে দেখতে: ঘর ফাঁকা, কেউ নেই।

বনমালীর আনন্দের আর সীমা নাই। দুর্দান্ত অসুর তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে এই আনন্দেই সে বিভোর। সারা গ্রামে সে চপল শিশুর মত দাপাদাপি করে বেড়াল, পাণ্ডু মুখে তার অমানুষী উজ্জ্বল একটা দীপ্তি।

রোজই বিকেলে পাড়ার ছেলেরা মাঠে হাড়ুডু, লুকোচুরি খেলতে যায়, সে দিন বনমালীর ছোট ছেলেটিও গিয়েছিল তাদের সঙ্গে। সন্ধ্যে হয়ে গেল, তখনও খোকা ফিরছে না দেখে বনমালী তাকে খুঁজতে বেরুবে, এমন সময় দুজন ছেলে এসে খবর দিল যে খোকাকে পাওয়া যাচ্ছে না, হারিয়ে গিয়েছে! লাঠি আলো নিয়ে বনমালী বেরিয়ে পড়ল, সারা মাঠে, ঝোঁপে-ঝাঁপে, আঁতি পাঁতি করে খুঁজেও খোকাকে পাওয়া গেল না, ক্লান্ত দেহে, শ্রান্ত মনে বনমালী ফিরে এল।

খোকাকে হারিয়ে বড় দুঃখেই বনমালীর দিন কাটে।

তেমনি আগের মতই রাতের পর দিন, দিনের পর রাত আসে; তেমনি আগের মতই সূর্য্যি ওঠে, আগের মতই সন্ধ্যাবেলা তারার মালা পরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ উঁকি দেয়, কিন্তু বনমালীর কিছুই ভালো লাগে না—সদাই মনটা হু হু করে! ক্রমে যত দিন যায় বনমালীর চোখের জলও শুকিয়ে আসে, কিন্তু মাঝে মাঝে খোকার জন্য প্রাণটা তার বড়ই অধীর হয়ে কেঁদে ওঠে।

একদিন ভরা সন্ধ্যা বেলা মাঠের মাঝ দিয়ে বনমালী হাট সেরে ফিরছে। সেদিন মনটা তার বড়ই খারাপ। হাটে সে আজ শুনে এসেছে ক্রোশ পাচেক দূরে আর একটা মাঠে, নদীর ধারে না কি তার ছেলেকে পাওয়া গিয়েছে; সারা শরীরটা কিসের চাপে একেবারে চ্যাপ্টা—জীবনের লেশ নাই।

মনটা তা'র দুঃখে একেবারে নুয়ে পড়েছিল—চোখের জল আর কোনও বাধা মান্‌ল না। হঠাৎ অনেক দূরে, আকাশ যেখানে ঝুঁকে এসে মাটির বুকের উপর নুয়ে পড়ে, মানুষের মত আবছা কি একটা বনমালীর নজরে পড়ল। চোখের পাতা পড়তে না পড়তে সেটা এসে গেল হাত দশেকের মধ্যে।

বনমালী শিউরে উঠল, এ যে তারই তৈরী সেই অতিকায় রাক্ষস ; এক এক পা ফেলে সাতাশ হাত জমী ডিঙ্গিয়ে চলেছে—বাঁ হাতটা মুঠো করে বুকের কাছে তোলা ডান হাত খানা পাশে ঝুলছে। যে কাপড় জামা বনমালী পরিয়ে দিয়েছিল, ছিড়ে তা' ফালি ফালি। সেই ছেঁড়া জামার ফাঁকে ফাঁকে তা'র কটা চামড়া দেখা যায়—তারই নিচে বুকের পাঁজরা গুলো উঁকি মারে। হাত পায়ের শিরাগুলো মোটা নীল দড়ির মত ফুলে উঠেছে। কালো বিকৃত মুখখানার ভিতর থেকে সারি সারি স্ফটিকের মত সাদা ধব্ধবে দাঁত বেরিয়ে যেন কামড়াতে তেড়ে আসে।

অতিকায়কে দেখেই বনমালীর বুক কেঁপে উঠল ; ছেলের ঐ খবরেই তার দুর্ব্বল মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এখন হঠাৎ এই বিভীষিকা দেখে সে আরও বিচলিত হয়ে পড়ল। কি জানি কেন, তা'র ছেলের মৃত্যু আর এই বিভীষিকা এক সাথে জড়িয়ে ফেলে সে স্থির করে নিল যে এই বিভীষিকাই তার ছেলের মৃত্যুর কারণ।

অতিকায় এতক্ষণ ঘাড় গুঁজে চলেছিল। চোখ তুলে সামনে বনমালীকে দেখেই সে হেসে ফেলল।

ওঃ কি বিকট সে হাসি! একটা মড়ার খুলি হঠাৎ সাদা সাদা দাঁতের সারি বের করে হাসলে যা হয়, এ সেই রকম হাসি। হাসির সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাড়গুলো খট্‌খট্‌ করে নড়ে উঠল, বোধ হয় সে গুলো বনমালী ঠিক করে বসাতে পারে নি। হাসি কাণে যেতেই বনমালীর রক্ত জল! হাতের কাছেই একটা গাছের ডাল চেপে না ধরলে সে বোধ হয় তখুনি গড়িয়ে পড়ত। কালো বিকট মুণ্ডের মাঝে তুপাটি সাদা দাঁত বার করে মূর্ত্তিটা বলল,

"কেয়াবাৎ ওস্তাদ! তোমার সঙ্গে কথা আছে। যেখানে যাই সবাই তাড়া করে; মানুষ জাতটার উপর বিশ্রী ঘৃণা হল। আমি ভালো বাসলেও কেউ আমায় চায় না। সব মানুষকে ধ্বংস করব। সে দিন ছোট্ট একটা বাচ্ছা খেলতে খেলতে একটা ঝোপে এসে লুকোল; তা'র সাথে ভাব করতে গেলাম, মিষ্টি কথাত কইলই না, রাক্ষস ভূত বলে গালাগালি দিল। একটু রেগে চেপে ধরলাম, পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল— একটা নদীর ধারে ফেলে দিলাম"—

অতিকায়ের আর বলা হোল না। থর থর করে কেঁপে বনমালী মাটির ওপর বসে পড়ল, তুহাতে মুখ

ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে সে বলতে লাগল,— "রাক্ষস! পিশাচ! তুইই তবে আমার বাছাকে খুন করেছিস। তুইই আমার মাণিককে আমার বংশের হুলালকে খেয়েছিস্! রাক্ষস!"—রাগে হুঃখে পাগল হয়ে বনমালী অতিকায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অবহেলা-ভরে বাঁ হাতে তা'কে সরিয়ে দিয়ে অতিকায় বলতে লাগল, 'ওস্তাদ! মিছে কেন মরবে? তুমিই আমাকে কোটী মানুষের জোর দিয়েছ; তুমিই আমায় নিজের চেয়ে, হুনিয়ায় সবারই চেয়ে বড় করেছ। আমারও প্রাণের মায়া আছে; নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে তোমার প্রাণ যেতে পারে,—হুসিয়ার!"

রাগে হুঃখে ফুলে ফুলে বনমালী শুনতে লাগল, "ওস্তাদ, বাচ্ছাটা যে তোমার ছিল জানতাম না; তা' হলে হয় ত' মারতাম না, কারণ তুমিই ত আমায় বানিয়েছ, আমি কি এতই নিমকহারাম"—অতিকায়ের কথা শেষ হ'ল না; হঠাৎ ঝড়ের বেগে মাঠের ওপর দিয়ে সে ছুটে গেল—পলক ফেলতে না ফেলতে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বনমালী উঠে দাঁড়াল। ভারী মন আরও ভারী করে বার বার

সে প্রতিজ্ঞা করল যেমন করে পারে তা'র আপন হাতে গড়া অতিকায়কে আপনি ধ্বংস করবে।

কয়েক দিনের পর ;—পাড়ার মজলিশে সকলে গল্পে মশগুল ; বনমালী ও আছে সেখানে। হঠাৎ ঝড়ের বেগে অতিকায় এসে উপস্থিত ; মিনতি করে সে বল্‌ল, "কেউ আমায় ঠাঁই দেয় না, তোমরা দেবে গো ?" মজলিশের পাণ্ডা হরিশ খুড়ো বার দুই "ভূত ভূত" বলেই "রাম রাম" ডাক ছাড়তে লাগলেন। গ্রামের পুরোহিত চামুণ্ডাচরণ পৈতে হাতে করে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—সব লোক হৈ হৈ করে উঠল।

রাগে অতিকায়ের হাত দুটো মুঠো হ'ল। দাঁতে দাঁত ঘসে, চোখ পাকিয়ে, এক নিমিষে পাঁচ সাত জনের ঘাড় ধরে সে মাথায় মাথায় ঠুকে দিলে—মাথা ফেটে তারা লুটিয়ে পড়ল।

"ওস্তাদ, এ তোমারই কাজ !" চীৎকার করে যেমন ঝড়ের মত এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মত অতিকায় চলে গেল—সব লোক ভয়ে কাঠ !

পরদিন সকাল হতেই বনমালী একটা দল জুটিয়ে ঠিক করলে—কাজ হল তাদের অতিকায়কে খুজে বের করা। সে কি সহজ ব্যাপার ? বিকেল বেলা হয় ত

এ গ্রামে মাঠের মাঝে তাকে দেখা গেল, সন্ধ্যা হতে না হতেই দশ বার ক্রোশ দূরের আরও একটা গ্রামে হয় ত পাঁচ সাত জনকে টিপে মেরে ভোর বেলা সে হয় ত আরও ত্রিশ ক্রোশ দূরে নদীতে সাঁতার কাটছে।

যাই হোক বনমালীর দল বেরোলো তাকে খুঁজতে। যেখানে শোনে মানুষ খুন হয়েছে, জানে সেটা অতি-কায়ের কাণ্ড। পথে ছোট ছেলেরা বেরোতে পায় না, ঝড়ের মত ছুটে এসে কে তাদের টেনে নিয়ে যায়। সুন্দরী মেয়ের দল ভয়ে তটস্থ। আকাশ বাতাস কাপিয়ে কে বলে, "আমায় বিয়ে করবি?" মেয়ের দল শিউরে ওঠে, এক নিমেষে বিরাট অতিকায় এসে পনের জনকে বুকে তুলে, নিয়ে চলে যায়। গরু, ভেড়ার কিছুই হয় না—যত রোখ মানুষের ওপব।

খুঁজতে খুঁজতে একদিন বলমালীর দল এক নদীর ধারে গিয়ে হাজির। নদীর ওপারে প্রকাণ্ড পাহাড়, চূড়ো তার আকাশ ফুঁড়ে মেঘের দেশে মিশে গেছে। ক্লান্ত হয়ে সবাই একটু জিরুচ্ছে, এমন সময় সেই পাহাড়ের চূড়োর ওপর অতিকায় এসে হাজির।

রাগে তা'র শরীর কাঁপছে, মাথার চুল খাড়া হয়ে

উঠেছে ; মাথাটা ঠেকেছে আকাশে, রক্তজবা চোখ দুটো আগুনের মতই জ্বলছে। হেঁকে সে বল্‌ল,—

"ওস্তাদ, এ সব তোমারই কীর্ত্তি! কেন আমায় বানালে? আমায় বানালে যদি, আমার সাথী বানালে না কেন? কেউ আমায় ঠাঁই দেয় না, কেউ আমায় চায় না, আমি সবারই বাইরে। তুমিই আমার দুঃখের মূল, ভুগেছ তুমিই বেশী! দুনিয়া থেকে মানুষের নাম মুছে দেব—তোমার মত কুকাজ কেউ যেন না করে। আমার এ বিরাট ক্ষুধা মিট্‌ল না, এ পিয়াস মানুষের লহুতে মেটাব।"

বলতে বলতে অতিকায় এসে লাফিয়ে পড়ল বনমালীর সঙ্গীদের ওপর এক নিমেষে এগার জন ধূলায় মিশিয়ে গেল। বনমালীর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল, "রাক্ষস! তুই পৃথিবী ধ্বংস করবি, তার আগে আমায় মার। আমিই তোকে প্রাণ দিয়েছি, আমারই মরণ হোক তোর হাতে।"—পাগলের মত সে অতিকায়ের বুকের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে অবিরল কিল ঘুসি মারতে লাগল; হায়রে তাতে অসুরের কি হবে! উৎকট এক আনন্দে অতিকায়ের মুখ জ্বলে উঠল ;— দাঁতের ফাঁক দিয়ে চেপে সে বল্‌ল, "ওস্তাদ, আজ

তোমার লহুতে আমার পিয়াস মিটবে"—পরক্ষণেই বনমালী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল প্রাণহীন।

বনমালী প্রাণহীন হয়ে লুটিয়ে পড়তেই অতিকায়ের ভাব বদলে গেল। চোখে আর তার রাগের লেশ নেই, সারা শরীরে অবসাদের ছায়া। জড়িত স্বরে সে বলতে লাগ্‌ল,

"তোমার লহুতে পিপাসা মিটল, তুমিই আমার শেষ আহুতি। আমার দুনিয়ার কাজ ফুরাল, তোমার মত কেউ আর মানুষ বানাবে না। বুকের মাঝে যে আগুন জ্বলে, এবার নিব্‌বে—একেবারে নিব্‌বে। একলা থাকা—উঃ কি সে জ্বালা—আমিই জানি, শুধু আমিই জানি। জ্বালা এবার নিববে—একেবারে নিববে।

টলতে টলতে অতিকায় নদীর ধারে এগিয়ে গেল—এক পা এক পা করে—শেষ একবার পৃথিবীর পানে চেয়ে, নীল আকাশের গায়ে চোখ বুলিয়ে অতিকায় জলে গা এলিয়ে দিল,—ঝপ্‌ করে একটা বিরাট আওয়াজ শোনা গেল—অতিকায় আর উঠ্‌ল না।

রাজা-হজম

ভঙ্গীপ্রসাদ জটাজুট তিন্তিড়ীপুরের মহারাজ। অসংখ্য তাঁর টাকা, অগণিত তাঁর সৈন্য সামন্ত, চঞ্চলা কমলা তাঁর ঘরে বাঁধা।

কিন্তু এমন রাজা—তাঁর মনে সুখ নাই। দুধের মত সাদা, বিড়ালের ছানার মতন নরম বিছানা তাঁর গায়ে কাঁটার মত ফোটে, দিব্য রাবড়ীর রাজভোগ দেখলে গা বমি বমি করে—কিছুই ভালো লাগে না।

কারণ ?—তা কে জানে ? কেউ কিছু ঠিক করতে পারলে না। সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দেওয়া হল রাজার কি অসুখ হয়েছে যে ধরে দিতে পারবে তার কোটী মুদ্রা বখ্শীষ।

দিন যায়, মাস যায়, বছরও কেটে যায়, কেউ বখশীষের লোভে আসে না, রাজারও অসুখ সমানে বেড়ে চলে। ভেবে ভেবে মহারাণীর মাথার চুল পেকে গিয়েছে, ভেবে ভেবে বুড়ো মন্ত্রীর আমাশয় হয়েছে, দাস-দাসী-লোক-লস্কর-সৈন্য-সামন্ত ভেবে ভেবে সবারই মাথা ধরে উঠেছে কিন্তু রাজার অসুখ কমবার কোনই লক্ষণ নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যেবেলা ছোট্ট একটা চাষার ছেলে এসে বল্‌লে "মহারাজের অসুখ ধরে দেব।" রাজপ্রাসাদে সাড়া পড়ে গেল; অনেক খাতির করে তাকে নিয়ে যাওয়া হল রাজার ঘরে। মখমলে ঢাকা, সোনার কাজ করা মোটা গোল বালিশ আঁকরে রাজা শুয়েছিলেন, কাতর সুরে বল্‌লেন. "কি হয়েছে যদি বলতে পার, পুরস্কার কোটী মুদ্রা।"

চারিধারে চেয়ে, ওপরে, নীচে দেখে, এক আঙ্গুলে রাজার ভুঁড়িটা ছুঁয়ে ছোট্ট ছেলেটা চোখ দুটো বুজে নিয়ে বল্‌ল, "রাজার বদ্‌-হজম হয়েছে।"

শাখ-নহবৎ বেজে উঠল; সেপাই-শান্ত্রীর খাপে ভরা তরোয়ালগুলো ঝণঝণ করে উঠল, আনন্দের রোল পড়ে গেল চারিদিকে। কোটী টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়ে যেতেই ছোট্ট ছেলেটা হঠাৎ কোন দিকে পালিয়ে গেল কে জানে?

রাজা ভারী খুসী; মন্ত্রী পারিষদ্ আনন্দে দিশে-হারা, মহারাণীর মুখে হাসি ধরে না। হঠাৎ মুখ কালো করে রাজা বললেন, "কিন্তু অসুখ সারবে কি করে?"—তাইত! অসুখ সারবে কি করে? সবারই

মুখ চূণ। খোঁজ খোঁজ—সে ছোট্ট চাষার ছেলেটাকে আর খুজে পাওয়া গেল না।

আবার দুশ্চিন্তা,—আবার সবারই মুখ আঁধার।

একদিন মহারাজ হাওয়া খেতে গিয়েছেন নদীর ধারে; রাজার মন খুসী রাখবার জন্য পাত্রমিত্র কত রকম সতি-মিথ্যে গল্প করছে, হঠাৎ রাজা ভৃঙ্গীপ্রসাদ বললেন, "ঐ–ঐ দেখ"—

তাইত! কাছেই একটা গাছের ডালে বসে একটা কাক পরম আনন্দে একটা মরা ইদুর খাচ্ছে। একবার ইদুরের পেটে ঠুক্‌রে দিয়ে, বার দুই গলা ফুলিয়ে, কা,-কা করে ডেকে আবার ঠোক্‌রাচ্ছে। রাজা অবাক্ হয়ে গাছ তলায় দাঁড়ালেন, পাত্রমিত্রও দাঁড়াল সাথে সাথে।

হঠাৎ কাকটা বাঁ পা দিয়ে ইদুরটা চেপে ধরে খুব জোরে গাছের ডালে ঠোঁটটা মুছতে লাগল। তারপর আরও কি ক'রত জানি না, হঠাৎ রাজাবাহাদুরের উল্লাসে হাততালি দেওয়াতে ডানা মেলে সাঁ করে উড়ে গেল।

কি ব্যাপার? কি ব্যাপার? গম্ভীরভাবে ভৃঙ্গী-প্রসাদ বললেন যে মরা ইদুর খেয়েও কাকজাতির বদ্-

হজম হয় না কেন, কেউ জানে কি ?—পাত্রমিত্র চুপ্—তাইত ! তাইত !

আরও গম্ভীর হয়ে রাজাবাহাদুর বল্লেন যে সেই গাছের ছালের এমন কোনও একটা হজমী গুণ আছে যা'তে মরা ইঁদুর ও হজম হয়ে যায়, নইলে ইঁদুরটা খেতে খেতে কাক গাছের ছালে ঠোকরাচ্ছিল কেন ?

বটেই ত ! বটেই ত ! পাত্রমিত্র এগিয়ে এসে বললে, "মহারাজ, সত্যি-সত্যি তাই !"

গাছের তলে এত গোলমাল শুনে একটা কাঠ-ঠোক্‌রা বেরিয়ে এসেছিল কোটর থেকে ব্যাপারটা কি জানতে। শুধু কতগুলো মানুষের ছা দেখে সে নিশ্চিন্ত মনে গাছে ঠোক্‌রাতে লাগল।

আবার হাততালি দিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন, "ঐ দেখ, ও পাখীটাও ভূরিভোজনের পর হজমী নিতে এসেছে।" "তাইত ! আর কোনও ভুল নাই।"

আর কোন চিন্তা নাই। এই গাছের একটুখানি ছাল খাবার পর খেলেই বদহজম সারতে বাধ্য। পকেট থেকে ছুরী বার করে রাজাবাহাদুর নিজের হাতে গাছের গুড়িতে বসিয়ে দিলেন এক চোট্। আশ্চর্য্য ! ছুরীর ফলাব আধখানা হজম হয়ে গেল।

রাজা স্তম্ভিত ! পাত্রমিত্র বিমূঢ় । লোহার ছুরী, যদি হজম হয়, রাজাবাহাদুরের বদহজম সারতে আর ক'দিন লাগে ? পাত্রমিত্র ছুটে গিয়ে খান কয়েক দা, ছোরাছুরী নিয়ে এল। অবাক কাণ্ড ! এক একটা করে হাতিয়ার গাছের গুড়িতে বসিয়ে দিতেই লোহার ফলাগুলো গাছের মধ্যে হজম হয়ে যায়।

মুস্কিল ! গাছের ছাল পাওয়া যাবে কি করে ? চিন্তায় ভৃঙ্গীপ্রসাদের কপালে ভ্রুকুটি দেখা দিল, পাত্র-মিত্রের ছুটে গেল কাল ঘাম।

একটুখানি ভাবার পরই রাজাবাহাদুর বললেন, "হয়েছে, হয়েছে।" আনন্দে পাত্রমিত্র লাফিয়ে উঠল।

গাছের তলায় যে কয় টুকরো ছাল পড়ে আছে তাই নিয়ে গেলেই ত হয় ; সারা গাছটা কাটার কি প্রয়োজন ?—তাইত ! কয়টুকরো ছাল কুড়িয়ে নিয়ে সদর্পে রাজাবাহাদুর প্রাসাদে ফিরে এলেন।

সন্ধ্যাবেলা—বিরাট্ ভোজ ; বদ্‌হজমের ওষুধ পাওয়া গিয়েছে—স্ফূর্ত্তিসে খেয়ে নাও।

আকণ্ঠ ভোজন করে, পালকের বিছানায় গোল বালিশ আকড়ে, সোনার আলবোলায় হীরের নল মুখে করে, রাজা ঘুমোলেন—পাত্রমিত্র নিশ্চিন্ত।

সকাল হোল; কাক-কোকিল, ফিঙ্গে-শালিকের কথাবার্ত্তা, আলাপ—গালাগালিতে চারিদিক ভরে উঠল; নহবৎখানায় নহবৎ ভোরের রাগিণীতে পোঁ—ধরল, কিন্তু রাজাবাহাদুরের ঘুম ভাঙ্গে না।

বেলা বেড়েই চলে—রাজার উঠবার নাম নাই। রাণী বার বার দোর গোড়া থেকে ঘুরে গেলেন, রাজার খাস খানসামা বসেই আছে—রাজাবাহাদুর দোর খোলেন না কেন?

বেলা দুপুর হল; রাণীর আদেশে ছুতোর মিস্ত্রী ডাকিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হল রাজার দুয়োর। পাত্রমিত্র ছুটে গিয়ে অবাক; রাণী অবাক; কারও মুখে কথা সরে না।

ব্যাপার কি?—কাল রাতে অমন অব্যর্থ হজমীর গুণে আজ মহারাজ ভৃঙ্গীপ্রসাদ জটাজুট সব খাবারের সাথে সাথে নিজেও হজম হয়ে গিয়েছেন—পালঙ্কে পড়ে আছে শুধু তার খোল-খানি!

সোনার কৌটা

সে অনেক দিনের কথা। তখন চীন দেশে কিউ ও পাওস্যু, নামে দুই বন্ধু বাস ক'রত। দুই বন্ধুর গলাগলি ভাব। লোকে বলত যেন তারা ঠিক হরি-হর। কখনও একদিনের জন্যও তাদের মধ্যে রাগারাগি হত না—এমনি ছিল তাদের ভালোবাসা।

তখন বসন্তকাল—চারিদিক ফলে ফুলে হেসে উঠেছে, দুই বন্ধু পরামর্শ করল—সহর থেকে বেড়িয়ে গিয়ে বনের খোলা বাতাসে তারা প্রাণটা হাল্‌কা করে আসবে। কিউ বল্লে—রোজ ত্রিশ দিন ঘাড় গুঁজে বই পড়তে পড়তে মাথাটা ঘুরে উঠেছে। এত বিদ্যে মাথায় ঠাসা হয়েছে যে আর কিছুদিন এমনি করে পড়লেই পাগল হয়ে যেতে হবে। পাউস্যু উত্তর দিলে—আর ভাই বল কেন? বারো মাস খেটে খেটে শরীরটা এত ক্লান্ত হয়েছে যে মনে হচ্ছে হাত পা গুলো যেন খসে পড়বে। মনিবটা কি ছুটি দিতে চায়? অনেক বলে কয়ে একটা দিন ছুটি পেয়েছি, চল বনের খোলা হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে আসি। যেমন কথা তেমনি কাজ।

দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করে চল্‌ল পাইন্ বনে বেড়াতে।

এ রাস্তা, সে রাস্তা, এ গাছের পাশে সে গাছের পাশে—এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে তারা বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ল। একটা বড় মতন গাছ দেখে তার ছায়ার নিচে বসতে যাবে—এমন সময় দেখে কি না গাছের গুঁড়ির কাছে—ঠিক তাদের সামনেই একটা সোনার কৌটা রোদে ঝক্‌মক্ করছে। ঐ দেখ্ ভাই, ওটা কি! বলে দুইবন্ধুই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল্। কিউ কৌটোটা তুলে নিয়ে পাওসুকে দিয়ে বল্লে—ভাই, এটা তুমি আগে দেখ্‌তে পেয়েছ—অতএব এটা তোমারই। পাওসু চেঁচিয়ে উঠল,—সে কি! তুমি আগে দেখে পরে আমাকে দেখিয়েছ—এটা তোমার, তুমি নাও। এ বলে তুমি নাও ও বলে না ওটা তোমার, এমনি করে তারা তুমুল গণ্ডগোল বাধিয়ে তুল্লে। অবশেষে কোনও মীমাংসা করতে না পেরে কৌটোটা আগে যেখানে ছিল ঠিক সেইখানে রেখে তারা হাত ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে গেল! দুই জনাই ভারী খুসী—বন্ধুর জন্য সে শুধু সোনার কৌটা কেন—সব জিনিষ ছাড়তে পারে এই ভেবে।

চলতে চলতে তারা একটা ঝরণার কাছে এসে উপস্থিত। দেখে একটা লোক চৌদ্দ পোয়া হয়ে ঘুমুচ্ছে।

দুই বন্ধু তাকে গিয়ে ঠেলে তুল্লে, বল্লে—"ওহে তোমার জন্য রাস্তায় একটা সোনার কৌটা পড়ে আছে আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছ।" সোনার কৌটো' এই কথা কানে যেতেই লোকটা তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল। তখন কিউ আর পাওস্যু দুজনে মিলে তাকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিলে কোথায় কোন গাছের তলে, কেমন করে কোন রাস্তায় গেলে সে সোনার কৌটা পাবে। তাদের কথা শেষ না হতেই লোকটা—ভোঁ—দৌড়।

তখন কিউ আর পাওস্যু দুজনে মিলে ঝরণার ধারে বসে কত আবোল-তাবোল গল্প জুড়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে তারা দেখে যে সেই লোকটা চেঁচাতে চেঁচাতে তাদের কাছে দৌড়ে আস্‌ছে। কাছে আসতে না আসতেই সে ত যা তা বলে দুই বন্ধুকে গালাগালি দিতে লাগল। অনেক বলা কওয়ার পর কিছু ঠাণ্ডা হয়ে সে সব কথা খুলে বল্লে—"হুঁ মশাই, এ আপনাদের কি রকম ভদ্রতা! আর একটু হলেই ত আমার দফা রফা হয়েছিল! এই ভাবে কি গরীব লোককে ঠকাতে হয়। আমি ত আপনাদের কথা শুনে আহ্লাদে আঠখানা হয়ে ছুটে সেখানে গেলাম। গিয়েই দেখি ঠিক সেইখানে একটা প্রকাণ্ড কেউটে ফণা বাগিয়ে বসে আছে। আর একটু

হলেই তার ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিলাম আর কি। ভাগ্যে আমার কুড়ুল ছিল তাই বাছাধনকে এক কোপেই দু টুকরো করে ফেলেছি।"

দুইবন্ধু ত একেবারে 'থ'। এই দেখে এলাম সোনার কৌটো আর এই সেটা কেউটে হয়ে গেল। কিউ তখন সেই লোকটার হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বল্লে—"দেখ, তুমি আমাদের কথায় কষ্ট পেয়েছ কিছু মনে কারো না।" লোকটা নমস্কার করে চলে গেল। তখন পাওস্ বল্লে—চল ত দেখে আসি কি ব্যাপার! দুই বন্ধু আবার হাত ধরাধরি করে গল্প করতে করতে চলল সেই গাছের দিকে। সেই গাছতলায় এসে কারও মুখে আর কথা ফুটল না। দুইজনেই একেবারে হতভম্ব। কোথায় বা সেই সোনার কৌটা আর কোথায় বা সেই কেউটে, তার জায়গায় দুটো বড় বড় সোনার বাক্স।

দুই বন্ধুই দুটো বাক্স তুলে নিয়ে অন্যের হাতে দিলে। বাক্সর ঢাকা খুলে দেখা গেল দুই বাক্স ভরা সোনার মোহর ঝক্‌ঝক্ করছে আর এক টুকরো রূপোর পাতে লেখা আছে বড় বড় সোনার অক্ষরে—"বন্ধু-প্রীতির উপহার।"

চুষী

কাল সন্ধ্যাবেলা অবিরাম ঘণ্টাখানেক কান্না-কাটি করে মা'র কাছে বেদম বকুনি খেয়ে আবার বেহায়ার মত মা'রই পাশে ঘেঁসে শুয়েছি। ছোট দাদাটা কোথা থেকে এলো হুতুমের মত আদর কর'তে। বেজায় রাগ হল ; কী আর করি ? চুপটি করে ভাবতে লাগলাম কি করে সবাইকে জব্দ করা যায়।

কাঁদবার সময় মা যে চুষীটা মুখে এঁটে দিয়েছিল, খানিক পরেই বোতলের ছিপির মত ছটাস্ করে সেটা এক হাত দূরে পালিয়ে গেল। হঠাৎ কোথা থেকে নীল আকাশে নীল তারার মত একটা নীল আলো এসে সারা ঘরখানা নীল করে দিল। কি ব্যাপার, যেই ঘাড় ফিরিয়েছি, রবারের চুষীটা অমনি বার দুই নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসে ডেকে উঠ্‌ল, "এই সীলি, সীলি !"—তাই ত' ডাকে কে ? মা বাবা পাশে শুয়ে, দাদারা কাছে নাই, ডাকে কে ? কোনও উত্তর না পেয়ে চুষীটা আবার ডাকল, "এই রে সীলি"—তাই ত' দেখতে হ'ল। চোখ ফিরিয়ে দেখি থুথু মাখা চুষীটা ক্রমাগত দু'লছে আর ডাকছে, "সীলি, সীলি।"

আমি বললাম, "কিহে চূষী, অত চেঁচাও কেন? বল না!" একটুখানি গরম হয়ে চূষী বল্‌ল, "আঃ কি করিস্ সীলি! এত লোকের মাঝে চূষী চূষী করে হাল্লা কচ্ছিস্ কেন?" আমি অবাক! লোক আবার কই? চূষী বাধা দিয়ে বল্‌ল, "যাক্‌গে, আমাদের সভায় আসবি কি না বল্—শেষে দেরী হয়ে গেলে চল্‌বে না।" আমায় ভাবতে দেখে চূষী ধমক দিয়ে উঠ্‌ল, তাই কি আর করি, বললাম, "বেশ চল"। "আয়" বলে চূষীটা হেলে তুলে এগুতে লাগল, গুটি গুটি আমিও চল্লাম পেছনে। তুই তিন পা যেতে যেতেই সেই নীল আলোর মধ্যে ছোট্ট একটা গোলাপী আলো জ্বলতে লাগল; দেখতে দেখতে সেটা বড় হতে হতে শেষে হয়ে পড়ল আস্ত একটা 'অষ্টিন্' মোটর গাড়ী। নীল আলোর মাঝে গোলাপী 'অষ্টিন্'! চাকা চারখানা তার হলদে, ছাদটা বেগুণে, বাকী সবটা টক্‌টকে লাল! কাছে আসতেই গাড়ীর তুয়োর খুলে গেল, কিন্তু খুললে কে! ড্রাইভার তো নেই। যাক্ গে তা'তে কি! চূষী হেঁকে বল্‌ল, "সীলি, ওঠ্"।

মোটর চলতে লাগল। কত মাঠ, কত ঘাট, কত পাহাড় পর্ব্বত নদ-নদী, কত দেশ-বিদেশে পেরিয়ে

মোটর চলতে লাগল। হঠাৎ দেখি কাউকে কিছুই না বলে মোটর উঠ্‌তে লাগল ওপর দিকে। উঠ্‌তে উঠ্‌তে কখন যে সেটা চাঁদের মুলুকে এসে ঠেকেছে কিছুই টের পাই নি। টের পেয়ে দেখি গাড়ী ছুটে চলেছে মেঘের উপর দিয়ে—হাল্‌কা মেঘ—ভারী মেঘ—সাদা মেঘ—জলো মেঘ—আঙ্গুরের মত মেঘ, নীল তুলোর মত মেঘ, তারই ওপর দিয়ে। পাশে বসেছিল চূষী, বল্লাম "কি হে চূষী, তোমাদের সভা কোথায় হবে?" চূষী চুপ্‌। গাড়ীটা ধীরে ধীরে চাঁদে গিয়ে ঠেক্‌তেই চাঁদটা তিন টুকরো হয়ে খুলে গেল—অষ্টিন ঢুকে পড়ল তারই মধ্যে। উঃ চাঁদের ওপাশটা কী সুন্দর! পুরু মখমলের মত ঘাস—কি খাসা গাছগুলো; রাস্তার কাঁকড়গুলোও মুক্তোর মত নিটোল গোল। এক পাশে কি এক রকম একটা জীব ফিচকারী দিয়ে আকাশে রং ছিটিয়ে দিচ্ছে—সাদা, গোলাপী, লাল, নীল, সবুজ, হলদে,—আরও কত, নাম তা'র কি জানি! গাড়ীটা সেই ধারে যেতেই এক ফিচকারী রং আমাদের গায়েই ছিটিয়ে দিলে—বাঃ আমরা যেন ঝলমল করে উঠ্‌লাম।

কিছুদূর গিয়ে গাড়ীটা এসে থামল একটা বাগানের

পাশে। কি সুন্দর বাজনা বাজে—কিন্তু কে বাজায়, তা' কে জানে! চূষী বল্ল, "এই সীলি, চল্" আমি বললাম, "যাব না"। "চল্ না" বলে চূষীটা আমাকে একটুখানি ঠেলে দিয়ে নেমে পড়ল। চূষী নামতেই চারিধার থেকে উঠ্ল বিকট হৈ হৈ রব!—কে—রে! তা' কে জানে! আধ মিনিট পরেই দেখি হাজার হাজার চূষী—আমার চূষীর মতই থুথু মাখা—রৈ রৈ করে এসে আমাদের ঘিরে ফেললে। শুনলাম এইবার সভা হবে—বক্তৃতার বিষয় চূষী খাওয়ার শাস্তি।

যদিও আমার একটু একটু ভয় করতে লাগল, তবু আমি চূষীকে তা বলব কেন? হঠাৎ আমার চূষী ডাকলে "এই সীলি, এদিকে আয়।" সঙ্গে সঙ্গে হাজার চূষী হেঁকে উঠল, "এই সীলি, এদিকে আয়।" আমি একটু রাগ দেখিয়ে বললাম, "এ তোমাদের ভারী অন্যায়। আমার চূষী না হয় আমার নাম ধরে মাঝে মাঝে ডাকতে পারে, কিন্তু তোমরা ডাক কি সাহসে? চূষীব দল হৈ হৈ করে এগিয়ে এল ;—"কি সাহসে? তোমার চূষী! আরে রে মানুষের বাচ্ছা বলে কি! তোমার চূষী, আমার চূষী, চূষী কি কারও কেনা? বরং চূষীর তুমি, চূষীর আমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।

তোমার চূষী কি? তুমিই চূষীর!" হাজার চূষী এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠতেই আমি চুপ করেছিলাম, এত বকবার দরকার ছিল না। এখন আবার কথা বলতে যেই ঠোঁট খুলেছি, আমার চূষী বলল, "চুপ্;" সঙ্গে সঙ্গে হাজার চূষী ধমক দিল, "এই সীলি, চুপ্"—এক সাথে গোল বাধিয়ে কথা বলাই চূষীর দেশের কায়দা। হাজার চূষী বলে যেতে লাগল, "বলে দিলে আমার চূষী! কেন? তোমার কিসে? যদি তোমার না হোত তা হলে ত' আর কারও হ'ত; তা হলেই তোমার কি করে? আর তোমার হলেও ত' আর কারও হতে পারে; তোমার হবার আগে, কিংবা তোমার হবার পরে, কিংবা তোমার হবার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা"—আমি আর সহ্য করতে পারলাম না; "চুপ"! বলে খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম। হাজার চূষী যেন একটু থমকে গেল!

পাঁচ মিনিট পরে আমার চূষীকে বললাম, "তোমাদের সভার যে কথা ছিল, সেটা কি হল?" চূষী গম্ভীর ভাবে বল্ল, "হচ্ছে"!—কিছুই বুঝলাম না, যাক্‌গে! হঠাৎ একটা চূষী আমায় বল্লে, "তোমার নাম কি!" আমি কোনও উত্তর দেবার আগেই

আমার চূষী বলল, "ওর নাম যাই হোক, আমি ডাকি সীলি বলে।" সঙ্গে সঙ্গে হাজার চূষী চীৎকার করে উঠ্‌ল, "ওর নাম যাই হোক, ডাকি সীলি বলে।" আমি বেজায় বিরক্ত হয়ে বললাম, "তোমরা যদি শুধু এই কর, ত অমি বাড়ী যাই। আমার চূষী বলল, "আরে না, না, একটু থাম। অমনি আবার আকাশ ফাটিয়ে হাজার চূষী চেঁচিয়ে উঠল, "আরে না, না, একটু থাম। আমি ভীষণ চীৎকার করে বললাম, আবার—! বাস্ সব চুপ্!

কতক্ষণ পরে ঠিক মনে নাই,—মাঝে যেন একটু ঘুম এসেছিল, হঠাৎ হাজার চূষী ফিস্‌ফিস্ করে কি বলাবলি করতে লাগল। আমি ডেকে বললাম, "এই কি কথা হচ্ছে আমি শুনব—জোরে বল।" সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ্। আমি বললাম, "ইস্ এমন বেহায়া চূষী ত' দেখিনি; বিকট মুখ ভঙ্গী করে আমার চূষীটা বলল, "কি, বেহায়া!" হাজার চূষী গর্জ্জে উঠল, "কি, বেহায়া?" আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। চূষীরা বলে যেতে লাগল, "বেহায়া! তুমি বুড়ো খোকা! যখন তখন চূষী খাবে, থুথু মাখিয়ে আমাদের চেহারা রুগীর মত সাদা ফেঁকাসে বানাবে, দাঁতের মাঝে চূষীর

মুণ্ডুটা চেপ্টা করবে !—খেয়ে খেয়েও আশ মিটবে না ! যখন তখন আব্দার করবে—ব—ল চূষী ! আমাদের শ্রেষ্ঠ বীর যারা, মাথার মণি, দেশের গৌরব, জাতির বল,—যাদের অভাবে আমাদের চূষীর দেশ হাহাকার কর্চ্ছে, তাদের এমনি নির্ব্বিবাদে, নির্ব্বিচারে চিবুবে ! নিজে চূষী খাবে !—ছোট ভাই বোনদের খাওয়াবে—ছোট ছোট ছেলেদের সবাইকে খাওয়াবে—আমাদের রাজ্য ছারখার হবে আর বুক ফুলিয়ে আমাদের দেশে এসে, আমাদের মাঝে, আমাদেরই অপমান করবে, বলবে বেহায়া !!" ভীষণ রেগে চূষীর দল এই বক্তৃতা করে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

কি উত্তর দেব, ভেবে না পেয়ে বল্লাম, "আচ্ছা, তোমরা সব এক রকম কেন ? চূষী ত আরও কত রকম হয় ! হাজার চূষী সায় দিল, "হয়।" জিজ্ঞাসা করলাম, "তবে" ? কোনও জবাব নাই ! আরে, এ গুলো কি ! হঠাৎ একটা বড় চূষী দাড়িয়ে উঠে বলতে লাগল, "আজকার সভা সমাপ্ত ! ফলাফল পড়ি, সকলে শুন্নুন। রোজ, ত্রিশ দিন, বার মাস, সারা বছর, কত কোটী কোটী সুস্থ সবল চূষী এই সব "সীলি"দের কবলে পড়িয়া ফেঁকাসে ও বৃদ্ধ হয়, তা আর

কে বলিবে? এই সীলির দল তাহা বোঝে না।
কান্না আসলেই বোতলের ছিপির মত তাহারা মুখে
চূষী আঁটিয়া দেয়। তাহারা নামেও সীলি এবং
কাজেও সীলি অর্থাৎ গো মূর্খ!" (Silly)

বক্তৃতাটা এতদূর এগোতেই আমি বাধা দিয়ে
বললাম, "আমার কিছু বলবার আছে। তোমরা
বাংলায় কথা কইতে কইতে, হঠাৎ শেষকালে যে একটা
ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করলে, সেটা কি ভালো হল?
ভাল বক্তৃতা, শুদ্ধ বক্তৃতায় কি এমন হওয়া উচিত?"
আমার চূষী উত্তর দিল, "কেন হবে না? বাঙ্গালী,
সাহেব,—সব দেশী মিলে চূষী খেতে পারে আর আমরা
বাংলা, সাহেবী, সব মিশিয়ে বলতে পাব না?" হাজার
চূষী গর্জ্জে উঠ্‌ল, "বলতে পাব না"? তাই সেই বড়
চূষীটা আবার বলে• যেতে লাগল—আজকার এই
সভায় স্থির হইল যে এই সব বাংলা সীলিদের কঠোর
শাস্তি দেওয়া দরকার। হাজার চূষী সমস্বরে ডেকে
বলল, "দরকার"। আমি আবার বাধা দিয়ে বললাম
তোমরা এক কথা যতবার খুসী বল, আমার আর
ভালো লাগছে না। খিদে পেয়েছে—আমি বাড়ী যাই;
বলেই আনমনে হাতের কাছে যে চূষীটা ছিল, তাকেই

ধরে দিয়েছি মুখে পুরে। হঠাৎ আকাশ ফেটে বাজ পড়ার মত বিকট শব্দে হাজার হাজার চূষী চেঁচিয়ে উঠল, "এ কি! এ কি! অত্যাচার! আমাদের দেশে বাস করে, আমাদেরই ধরে খাওয়া! আক্রমণ কর—মেরে ফেল!" বলতে বলতে থুথু মাখা, লালা-ঢাকা সেই হাজার চূষী হেলে দুলে এগিয়ে এল আমায় মারতে! এই মারে আর কি! এই এসে পড়ল গায়ের ওপর! ঐ মারলে, মা! বাবা! এ্যা দি দি!

যাঃ এ কি! মা ডাকছে, সীলি ওঠ! বাবা বলছে, "ওঠ রে।" দেড় মিনিট হতভম্ব হয়ে ফেল ফেল করে তাকিয়ে হঠাৎ কতক আনন্দে, কতক ভয়ে আবার আমি কেঁদে দিলাম "ভ্যা—মা—চূষী!"

সিপাহী

খুকুমণির খেলাঘরের টিনের সিপাহী। নীল কোট, লাল পাগড়ী আঁটা, দিনের পর দিন সে খেলাঘরে কাটিয়ে দেয়, সবাই জানে সে শুধু টিনের সিপাহী। সে যে জগতে একা, তা নয়। দুটি ভাই তারা, পূজোর সময় খুকুমণি তাদের কিনে এনেছিল ; দুইটি ভাইএর মধ্যে খোকাবাবু একটিকে চিবিয়ে দিয়েছেন, বাকী আছে এইটি।

সিপাহী সে ; তার পাগড়ীর রং বইএর লাল মলাটের মতই লাল, গায়ের কোট মেম-পুতুলের চোখের তারার মত নীল। বাঁ হাতে তার বন্দুক লেগেই আছে, চোখে পলক পড়ে না কখনও।

খুকুমণির খেলাঘরে গাড়ী, ঘোড়া, পুতুল, ঝুমঝুমি, শ্লেট, পেন্সিল আরও কত কি আছে। সিপাহীর কিন্তু কাউকে পছন্দ হয় না। কাণ-কাটা, বেজোর, ময়লা তাস গুলোর মধ্যে ঐ যে ছেড়া ইস্কাপণের বিবি, তাকেই সিপাহীর ভালো লাগে খুব। কতদিন তার ইচ্ছে হয়েছে, গলা ছেড়ে বিবিকে একটু ডাকে, "ওগো" কিন্তু কোনও দিন সাহসে কুলোয় নি।

আজ্‌গুবি

রোজ রাত্রে, সকলের ঘুমের পর খেলাঘরে ছোট খাট একটা কুরুক্ষেত্র ব্যাপার হয়। কাঠের ঘোড়া তিনটে অযথা কাপড়ের ভালুকটাকে গুতিয়ে দিতে চায়, বেতের চেয়ার খানা কাচের আলমারীর পিঠে কি ভেবে লাফিয়ে ওঠে জানা যায় না; পেটারার ভিতর মোমের পুতুলগুলো লাথালাথি করে ডালাটা খুলে ফেলতে চায়, ঝুমঝুমির দল এক মনে বাজতে থাকে; পুরাণ প্রথম ভাগ, ছবির বইএর কাণ মলে দেয়, পেন্সিলের সাথে শ্লেটের ঘুষোঘুষি আরম্ভ হয়। শুধু টিনের সিপাহী চুপ করে চেয়ে থাকে ইস্কাপণের বিবির দিকে আর বিবি চিৎ হয়ে পড়ে আকাশ পানে তাকিয়ে ভাবে।

পরশু সাঁঝে খুকুমণি আর একটা কাঠের ডিবে কিনে এনেছে। তা'র মধ্যে কি আছে কেউ জানে না। সেদিন রাতে রোজকার মতই সবে গণ্ডগোল সুরু হয়েছে; হঠাৎ কাঠের ডিবে খুলে গেল। ঘাড় উঁচিয়ে আধখানা গলা, একটা চ্যাপ্টা নাক, দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে জ্বল্‌জ্বলে চোখ আর একটুখানি পাকা দাড়ীওয়ালা একজন বার হয়ে প্রশ্ন করলেন, "কে হ্যা, কি ব্যাপার?"

সব গোলমাল হঠাৎ থেমে গেল ; গুঁতোগুঁতি, লাথালাথি, বাজনা—সব চুপ্। শুধু টিনের সিপাহী তেমনি চেয়ে রইল বন্দুক ঘাড়ে করে ইস্কাপনের বিবির দিকে, আর বিবি চেয়ে রইল ছাদের পানে।

বিশেষ চটে ডিবের নূতন জনটি টিনের সিপাহীর পানে চেয়ে ভ্রূকুটি করে বললেন, "আচ্ছা, দেখে নেব।"

পরদিন সকাল বেলা হঠাৎ খোকাবাবু এসে কি ভেবে টিনের সিপাহীকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সিপাহী মনে জানল এই অপমানটা কাল রাতের দাড়ীওয়ালার জন্যই হোল। খুকুমণি খোঁজ করতে গেলেন নীচে ; ধূলো চাপা পড়ে যাওয়াতে সিপাহীর খোঁজ পাওয়া গেল না। অবশ্য সিপাহীর ডাক দিলে নিশ্চয়ই তার উদ্ধার হয়ে যেত ; কিন্তু ছিঃ ! সে যে সিপাহী ;—বিপদে হাঁক ডাক করে কাপুরুষে।

খানিক পরেই আকাশ কালো ক'রে মেঘ ঘনিয়ে এলো। দৈত্য-দেশের ছেলে মেয়ের দল দামামা বাজিয়ে যেন সারা আকাশে দাপাদাপি ক'রতে সুরু করে দিল ; এলোচুলের মত গাছপালাগুলো দু' পাশে লতিয়ে পড়তে চায়· কে একটা পাগলা সারা

আকাশের বুকটা নখে এধার থেকে ওধার ছিঁড়ে ফেলে !

বন্দুকটা মাটিতে গুঁজে টিনের সিপাহী ওপর দিকে দুটো পা করে পথে পড়েছিল। দু' একটা বড় বড় ফোঁটার পিছু পিছু রাশি রাশি ছোট ছোট বৃষ্টির ফোঁটা তাড়া করে আসতেই সে এক পাশে ঢলে পড়ল।

একজোড়া দাদা-ভাই ছাতা মাথায় ভিজতে ভিজতে বাড়ী ফিরছিল। টিনের সিপাহী তা'দের নজরে পড়তেই, ভাই তাকে কুড়িয়ে নিল; দাদা পরামর্শ দিল, কাগজের নৌকা করে নালায় ভাসিয়ে দিলেই খাসা রগড় হ'বে।

কুগ্রহ,—কাগজের নৌকা চ'ড়ে, নালার মাঝে টিনের সিপাহী জলের তোড়ে ভেসে চলেছে, অকূলে। বাড়ীর পাশে, দেয়াল ঘেঁসে, বিষম বেগে কাগজ-তরী ছুটে চলে—মাঝখানে বন্দুক-ঘাড়ে টিনের সিপাহী একা যাত্রী।

হঠাৎ একটা সিঁড়ির তলে নৌকা ঢু'কতেই সব আঁধার। কোন্ কোণে একটা ধাড়ী ইঁদুর লুকিয়ে ছিল, ভোজপুরীদের মত হেঁকে বল্‌ল, "হুকুমদার—কাঁহা যাও—পাস্-লাইসন্স্-হুকুমনামা চাহি !"

টিনের সিপাহী চুপ্ ; ভোজপুরী ইঁদুর ছা'ড়বে না ; পিছু পিছু তাড়া ক'রে আসে। হঠাৎ একটা কোলা ব্যাং নৌকায় লাফিয়ে উঠে সব মাটি করে দিল। ভারে তরণী কাৎ হয়ে ছিঁড়ে গেল, সিপাহী প'ড়ে গেল নালার তলে, হু-হু করে জলের স্রোত তা'কে ভাসিয়ে নেয়, হঠাৎ মাথাটা একটু ঝিম্ ঝিম্ ক'রে ওঠে, কাণে ভোঁ-ভোঁ ক'রে—সহসা সিপাহী অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

জ্ঞান হতেই সিপাহী টের পেল যে সে একটা মাছের পেটে। কেমন করে যে এ অবস্থা তা' আর বৃথা ভেবে কি হবে, তাই টিনের সিপাহী বন্দুক-ঘাড়ে সটান শুয়ে পড়ল। সিপাহী-গ্রাস করা ত আর সহজ ব্যাপার নয় তাই মৎস্যরাজের পেট ব্যাথা করল খুবই।

পরদিন জলের মাঝে কি একটা ছোট্ট পোকা ন'ড়তে দেখে চাখ্তে যেতেই, সিপাহী শুদ্ধ মাছটা কা'র এক ছিপের ডগায় ভেসে উঠল। টিনের সিপাহী এ সব কিছুই জানে না ; বন্দুক-ঘাড়ে অতি নিশ্চিন্ত মনে তখনও সে শুয়ে আছে মাছের পেটে।

হঠাৎ এক ঝলক্ আলো চোখে লাগতেই সিপাহী চেয়ে দেখ্ল, দু' টুকরো মাছ হস্তে একটি মূর্ত্তিমতী হিড়িম্বা, মাটির পরে সে, পাশে তারই পুরাণ খুকুমণি।

হারানো সিপাহী ফিরে পেয়ে খুকুমণির একটু আনন্দ হোল। খোকাবাবুর কিন্তু পছন্দ হোল না মোটেই ; আর ত সিপাহীর সে জৌলুষ নাই।

হাতে তুলে খুকুমণি সিপাহী নিয়ে যাচ্ছিল ; কি মনে হওয়াতে বল্‌লে, "ছাই—রং সব উঠে গেছে, দূর হোক্‌—পুড়িয়ে দেব! হঠাৎ বিনা ভূমিকায় খুকু সিপাহীকে ছুঁড়ে দিল উনানের ভিতর গণগণে আগুনে ; পাশে দাঁড়িয়েছিল খোকাবাবু, হাতে তা'র ইস্কাপণের বিবি। সহসা সেও কি ভেবে বিবিকে আগুনে ফেলে দিল! সিপাহী আর ইস্কাপণের বিবিকে ঘিরে এক বার দপ্‌ করে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল; টিনের সিপাহী আর ইস্কাপণের বিবি এক সাথে উনান-চিতায় সহমরণে গেল!

ইতি শেষ

নিশ্চিন্ত পুরের মাধব চাটুয্যে চারের কোটা পেরিয়ে পাঁচের ঘরে যাব যাব করছেন। মাথার অর্দ্ধেক চুল উঠে গেছে, বাকী অর্দ্ধেক কাঁচা-পাকা মেশা। বিস্তর টাকা-কড়ি না থাকলেও অবস্থা তার নেহাৎ মন্দ নয়, খাওয়া-পরার ভাবনা কখনও ভাবতে হয় না।

কিন্তু এই মাধব চাটুয্যে বড় দুঃখী, বড় বিমর্ষ; সতের বছর বয়সে সে বিয়ে করেছিল প্রথম বার। তারপর পর পর তিনটি বউ মারা যাওয়াতে এইবার চতুর্থ সংস্করণ হয়েছে মাস ছয় সাত আগে। কিন্তু এতদিনেও তার একটি ছেলে হল না। চৌদ্দপুরুষ নির্ঘাত নরকে ডুববে, মাধব চাটুয্যে মরে গেলে তাদের মুখে জল দেবার আর যে কেউ থাকবে না। তাই চাটুয্যে ভাবে, ভাবে, খালি ভাবে। কত মানত, কত পূজো, কত কবচ-মাদুলী, কিছুতেই কিচ্ছু হয় না। পিতামহ যেন তার কপালে ছেলে লিখতে ভুলে গিয়েছেন।

ছেলে বেলায় মাধব চাটুয্যের এক বন্ধু ছিল, নাম তা'র ভূতনাথ। তার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে।

লেখাপড়া শিখবে বলে ভূতোর কাকা তাকে পাঠশালায় পাঠালেন কিন্তু মা সরস্বতীর সাথে আড়ি করে ভূতো লেখাপড়া কিচ্ছুই শিখল না।

যখন তা'র এগার বছর বয়স, হঠাৎ একদিন কাকা মারা গেলেন। কাকীমা কোন দিনই তার ওপর বিশেষ খুসী ছিলেন না তাই ভূতোর আর সে বাড়ীতে থাকা হোল না। লেখাপড়া না শিখলেও আরও অনেক ছোটখাট বিদ্যে ভূতো ইতিমধ্যে শিখে ফেলে ছিল। লোকের বাগান থেকে ফলমূল চুরী করে আনতে, এক দমে আধ খানা বিড়ি টেনে, অমায়িক ভাবে ধুঁয়ো গিলে নিয়ে, নাক দিয়ে ইঞ্জিনের মত সেটা বার করতে তার মত আর কেউ পারত কি না সন্দেহ। শরীরটাও বেশ বলশালী ছিল বলে দিনগুলো বেশ হেসে-খেলেই কেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু কাকার দেহত্যাগের পর ভূতনাথ একটু বিব্রত হয়ে পড়ল ; যাই হোক, একদিন সন্ধ্যাবেলা কাকীমার বাক্স থেকে গোটা কয়েক টাকা না বলে নিয়ে চুপি চুপি ভূতনাথ পালিয়ে এল কলকাতায়। এক ভদ্রলোক দয়া করে তাকে একটুখানি আশ্রয় দিয়েছিলেন, কিছু-দিন ভালো ছেলের মত ভূতো সেখানে থাকল। হঠাৎ

একদিন মাথায় কি খেয়াল চা'পল জানি না, ভূতনাথ রওনা হয়ে গেল কামরূপ। মন্ত্র-তন্ত্র শিখে সে ফিরে আসবে তারপর দেখে নেবে সবাইকে।

তেরো বছর ভূতোর আর খবর পাওয়া যায় নি। হঠাৎ একদিন বেলা একটার সময় সে নিশ্চিন্ত হয়ে এসে হাজির। মাথায় বড় বড় জটা, গায়ে ছাই, হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ত্রিশূল কমণ্ডলু আর গেরুয়া কাপড় দেখে সবাই জানল যে ভূতনাথ বিরাট্ সন্ন্যাসী হয়ে ফিরে এসেছে।

তেরো বছর সে ছিল কামরূপে; বহুবিধ মন্ত্র-তন্ত্র শিখে একটা বাবলা গাছে চড়ে সে উড়ে এসেছে—আমাদের সেই ভূতনাথ।

কয়েকদিনেই রটে গেল ভূতনাথ বাক্‌সিদ্ধ। তা'র মুখ দিয়ে যা' একবার বেরোবে, তা'র আর অন্যথা হবার জো নাই। দুষ্টু লোকেরা প্রমাণ চাইলে, ভূতোর শিষ্যেরা ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিল।

একদিন একটা বুড়ো ব্রাহ্মণ পুকুরে স্নান করছিল। পথে যেতে যেতে ভূতনাথ বল্‌ল, "কি ঠাকুর, স্নান করছ? —কর"। দেড়ঘণ্টা ক্রমাগত ডুবের পর ডুব দিয়ে বেচারা শেষে ক্লান্ত হয়ে একেবারে ডুবে গেল, আর উঠল না।

গাছের ডালে তিনটে হনুমান্ বসে লোকদের দাঁত দেখাচ্ছিল। ধীরে ধীরে ভূতনাথ বল্‌ল, "কিরে, দাঁত দেখাচ্ছিস্?–দেখা!"—সেই থেকে হনুমান তিনটে ক্রমাগত দাঁত খিচোচ্ছে, বিশ্বাস না হয় গেলেই দেখা যাবে।

শিষ্যদের এমন সব অকাট্য প্রমাণ পেয়ে তুষ্ট, লোকেরা চুপ্ মেরে গেল।

ক্রমে ক্রমে কথা গিয়ে উঠল মাধব চাটুয্যের কাণে। ভূতনাথ ফিরে এসেছে? সেই ভূতো? ছেলেবেলার সাথী? মাধব চাটুয্যে এলেন দেখা করতে কত সুখ দুঃখের কাহিণী হোল। ভূতো নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, কামরূপের কথা, কি করে লোক গেলেই সেখানকার মেয়েরা রামছাগল বানিয়ে দেয়, তা'র কথা গম্ভীরভাবে বলতে লাগল। মাধব চাটুযোও পুরাণ সখাকে সুখ-দুঃখের সব কাহিনী শুনিয়ে দিলেন।

বন্ধুর ছেলে হয় না শুনে ভূতনাথের হৃদয় গলে গেল। চোখ বুজে বল্‌লে, "ছেলে চাও? আচ্ছা!" শিষ্যের দল বিজয়-ধ্বনি করে উঠল আর কোনও চিন্তা নাই; চাটুয্যেও একটু খুসী মনে বাড়ী ফিরল, দেখাই যাক্ না!

পাড়ায় রটে গেল ভূতনাথ কথা দিয়েছে মাধব চাটুয্যের ছেলে হবে। ভূতোর কাছে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক আসতে লাগল, একটি প্রসাদী ফুল, একটু চরণামৃত, একটুখানি শ্রীঅঙ্গের ভস্ম !

আশ্চর্য্য ! সাত মাস পরেই মাধব চাটুয্যের একটা খোকা হ'ল—ভূতনাথের কথা মত তা'র নাম রাখা হোল হৃষীকেশ। ইতিমধ্যে ভূতো জটাজূট ফেলে দিয়েছে, স্বপ্নে তা'র প্রতি নাকি কামাখ্যা-দেবীর আদেশ হয়েছে বিয়ে করে সংসারী হবার জন্য। তাই ভূতো এখন পাকা সংসারী।

বছর খানেক ঘুরতেই মাধব চাটুয্যের আবার এক ছেলে হোল—খোকার নাম রাখা হোল, অখিলেশ। চুপি চুপি একদিন সন্ধ্যাবেলা ভূতো মাধব চাটুয্যের কানে কানে বললে যে কামাখ্যাদেবীর আদেশ হয়েছে যে মাধব চাটুজ্জের সব ছেলের নামে যেন মিল থাকে। বেচারা ভূতো—সে ত জানত না !

তিন বছরের মধ্যে আবার তিনটি খোকাতে মাধব চাটুয্যের ঘর ভরে উঠল। ভাইদের নাম সব এক রকম—কামাখ্যাদেবীর আদেশ। নামকরণ করে ভূতনাথ—দক্ষিণা উচিত মতই পাওয়া হয়। তাই

ছেলেদের নাম হয়েছে, হৃষীকেশ, অখিলেশ, প্রণবেশ, ভ্রমরেশ আর ত্রিদিবেশ।

পর পর এতগুলো ছেলে হয়ে পড়াতে মাধব চাটুয্যে একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছে; অবস্থা ত তার খুব ভালো নয়। বছর খানেক আর ছেলে পিলে হোল না—মাধব চাটুয্যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

হাজার হোক্—বাক্সিদ্ধের কথা, সে কি বিফল হবার? তাই পর পর তিন বছরে মাধবের আরও তিনটে ছেলে হোল—ভূতনাথ নাম রাখলে—অমরেশ, সমরেশ, অণিবেশ।

মাধব চাটুয্যে এবার বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এ কি বিপদ! কবে কোন্‌দিন ভূতো বলেছিল যে ছেলে হবে, তা' ছেলে হওয়ার আর কি শেষ নাই?

ভূতনাথেরও যে একটু মুস্কিল হয় নি, তা নয়। কুক্ষণে বেচারা বলেছিল যে ছেলেদের নাম সব মিলিয়ে রাখতে হবে। আবার যদি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়, কী নাম রাখা যাবে? ভাইদের সাথে মিলিয়ে আর ত নাম তা'র মনে পড়ে না। মিলিয়ে নাম রাখতে না পারলেই সকল জারিজুরি ধরা পড়ে যাবে—হায় হায় বিপদ ভীষণ।

দুই বছর খানেক পরেই আবার মাধব চাটুয্যের একটা খোকা হওয়াতে ভূতনাথ ও মাধব দুজনই বিষম বিরক্ত হয়ে উঠল।

চুপি চুপি মাধব চাটুয্যে বাল্য বন্ধু ভূতোকে শাসিয়ে দিল যে এবার ফের যদি ছেলে হয় তা' হলে ভূতোকে সে দেখে নেবে। ভূতনাথ বেচারা মহা বিপদে পড়ল। ছেলে হওয়া সে থামায় কি করে? আরও বিপদ যে নূতন খোকার কী নাম রাখা যায়?

পরদিন সকাল বেলা ভূতনাথ বসে তামাক খাচ্ছে, দু চার জন প্রতিবাসী আসে পাশে নানা গল্পে ব্যস্ত। ত্বরিত-পদে মাধব চাটুয্যে ছুটে এসে বল্‌ল, ভূতো, নূতন খোকার কি নাম হবে? ভূতো জবাব দিল, "সে হবে ঠিক; ব্যস্ত কি?

মাধব চাটুয্যে শুনবে না: নাম তা'র জানা চাইই; ভূতনাথ মহা বিব্রত; আর ত সে নাম মিলোতে পারছে না। হায় অদৃষ্ট, এ কি! এতদিনে কি ভূতনাথের সব ভণ্ডামী ধরা পড়ে যাবে?

ভাগ্যি একটা ফাজিল ছোকরা সেখানে কি করতে এসেছিল, নইলে সে দিনই ভূতনাথ অপ্রস্তুত হোত।

মুচ্‌কি হেসে মাধবের পানে চেয়ে ছোকরা বলল, "ঠাকুর দা, নূতন খোকার নাম রাখবেন? আমি একটা খাসা নাম বলতে পারি"— .

জিজ্ঞাসু ভাবে তার পানে চাইতেই সে বল্‌ল, "নাম রাখুন ইতি-শেষ, বেশ মিলে যাবে।"

হাসির রোলে মাধবের রক্ত-চাহনি ডুবে গেল। আরও গম্ভীর ভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভূতনাথ বলল, "ছোকরার মুখ দিয়েই দেবী বলে দিলেন, নূতন খোকার নাম হবে 'ইতিশেষ!"

আশ্চর্য্য! কিন্তু ইতি শেষের জন্মের পর এখন পর্য্যন্ত মাধব চাটুয্যের আর ছেলে পিলে হয় নি।